নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন ১২। ■ মার্চ ২০১৭

নবদিশা
শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে
সংকলন ১২ । মার্চ ২০১৭

সম্পাদকীয়

আছে আনন্দ, নেই ভয়
শিক্ষা এখানে বোধের উদয়

মা দাওয়ায় রান্না করছে। পাশেই খেলছে বছর পাঁচেকের শিশু। সদ্য কথা ফুটেছে। আচমকা সে দেখল, আগুনে পুড়ছে তার মায়ের আঁচল। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মাকে। ওমনি মহিলাও তা দেখতে পেয়ে দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলে। শিশুটির না ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, না ছিল চারপাশ সম্পর্কে ধারণা। শিশুমন বিশেষজ্ঞরা ঘটনাটির কী ব্যাখ্যা দেবেন জানা নেই। তবে শিশুটি যে আসলে একটা বিপদের আশঙ্কা করেছিল একথা নিশ্চিত। শিশুটিকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি যে, আগুনে তার মায়ের ক্ষতি হতে পারে। আসলে অনেক ঘটনা আছে যা আমাদের সঙ্গে প্রথমবার ঘটলেও তার গভীরতা আঁচ করা যায়, হয়তো ফলাফলও অনুমান করা যায়। বড় হতে হতে শৈশবে ঘটে যাওয়া এমন অনেক ঘটনার কারণ ও তার পরিণতি আমরা বুঝতে শিখি। বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার। হাতে-কলমে স্থানীয় বিষয়, চোখের সামনে ঘটা ঘটনা থেকে যে শিক্ষা আমরা অর্জন করি তাই প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। অনেকক্ষেত্রে যা আমৃত্যু মনেও থাকে।

অনেকটা এভাবেই যেন প্রথাগত শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বদলে দিয়েছে ফিনল্যান্ড। স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার সহায়তায় শিক্ষা হয়ে উঠেছে আরও প্রাসঙ্গিক, তৈরি হচ্ছে স্কুলভিত্তিক স্থানীয় পাঠক্রম। যা গোটা বিশ্বকে শিক্ষার পাঠক্রম ও শিখন পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাবাচ্ছে। এদেশেও শিক্ষার নীতি-নির্ধারকরা বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। ফের গুরুত্ব পাচ্ছে হাতে-কলমে স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। ২০০5 সালের জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখাতেও তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তবে নীতিনির্ধারকদের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। শিক্ষাকে অন্য আঙ্গিকে দেখতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে স্থানীয় শিক্ষায়, শিখন হবে আনন্দ-দায়ক ও ভয়হীন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শুধুই মনের বিকাশ, বোধের উদয় ঘটবে শৈশব থেকেই।

সূচিপত্র

১। সকলকে নিয়ে, সকলের জন্য - শিক্ষায় রঙিন ২
২। দুটি বই, কয়েকটি পৃষ্ঠা – শিক্ষা নিয়ে ৪
৩। শিক্ষায় স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার ৬
৪। স্থানীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা – কিছু অভিজ্ঞতা, ... ৭
৫। ভেতর ও বাইরের সংযোগই উন্মুক্ত শিক্ষার ৮
৬। হান্টার কমিশন – আধুনিক ভারতের প্রথম ১১
৭। নতুন শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয় শিক্ষার কিছু ১২
৮। জীবজন্তুদের স্কুল পাঠক্রম ১৪
৯। রবীন্দ্র চর্চায় শান্তিনিকেতন ও তাঁর শিক্ষা-ভাবনা . ১৬
১০। মাস্টারমশাই সমীপেষু পড়ার অভিজ্ঞতা - ১৬
১১। *বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা* ঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৭
১২। *এসো তাঁদের গল্প শোনাই* ঃ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯
১৩। *সেই সময়* ঃ অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা ২২
১৪। পঞ্চায়েতের হাত ধরে নতুন দিশা দেখালেন......... ২৪
১৫। পরিবেশে থেকে শিক্ষা, পরিবেশ থেকে শিক্ষা, ... ২৫
১৬। স্কুল বাগান নিয়ে রাজ্যের এমজিএনআরইজিএ .. ২৯

সকলকে নিয়ে, সকলের জন্য
শিক্ষায় রঙিন ফুল ফুটিয়েছে ফিনিশরা

আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বীজগণিত করি আর ভাবি, এই x-y-z -এর অঙ্ক সত্যিই কি আমার কোনও কাজে আসবে ? এই প্রশ্ন যখন আপনাকে আবার আপনার ছাত্রজীবনে নিয়ে গেল, তখন ভাবুনতো আপনি এমন একটা স্কুলে পড়ছেন, যেখানে আপনার শিক্ষক আপনাকে ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞান শেখানোর পরিবর্তে আপনাকে শেখাচ্ছে কীভাবে লাভের সঙ্গে মুদি দোকান চালাতে হয়। পুরো বিষয়টি আপনাকে ভাল করে বুঝিয়ে শিক্ষক চলে গেলেন পাশের বেঞ্চে বসে থাকা আপানার সহপাঠির কাছে। তাকে দোকানদারী না শিখিয়ে শিক্ষক স্বয়ং তার হাতে তুলে দিলেন কম্পিউটার গেমস্ ! মনে মনে হাসছেন ? ভাবছেন পাগলের প্রলাপ ? তবে শুনুন, এভাবেই পড়াশুনা চলছে পৃথিবীর একটি দেশে। এমন শিখন পদ্ধতিতে ভর করে গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বব্যাপী স্কুল সিস্টেমগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি স্থানের একটি দখল করে আছে ওই দেশ ! এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ? আসলে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে দিতে ওই দেশের পড়ুয়াদের একটু একটু করে প্রয়োগিকভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয় গণিত-বিজ্ঞান-দর্শন, নীতিবোধ এবং সকলে মিলে একসাথে কাজ করার সুফলগুলো। দেশটির নাম ফিনল্যান্ড, দক্ষিণ ইউরোপের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভেঙে পড়েছিল দেশটির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। যে যুদ্ধে এই দেশ লড়েছিল জার্মানির হয়ে। এখনও কোটি ছোঁয়নি ফিনল্যান্ডের জনসংখ্যা। অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভৌগলিক অবস্থানের নিরিখে এই দেশ মোটেই খুব ভাল অবস্থায় নেই। এমন পেছনের সারিতে থাকা একটা দেশ, গোটা বিশ্বকে আজ ভাবাচ্ছে, ভাবাচ্ছে তার উঠে দাঁড়ানোর গল্প। বিশেষ করে গত প্রায় দু'দশক ধরে প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের নতুন দিশা দেখানোর গল্প।

কিন্তু কীভাবে ঘুরে দাঁড়াল ফিনল্যান্ড, কী বা তাদের শিক্ষা-ভাবনা? প্রাথমিকে সাত বছরের আগে স্কুলেই যায় না সেখানকার শিশুরা। এমনকি ছ'বছর পর্যন্ত তাদের স্কুলে ভর্তির অযোগ্য হিসাবে মনে করা হয়। ১৬ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আগে ফিনল্যান্ডের শিশুদের যেন কোনও মোটা বইয়ের বোঝা বইতে হয় না হয় তারজন্য এই দীর্ঘ ন'বছর তাদের কোনও ধরনের বার্ষিক পরীক্ষায় বসতেও হয় না। ফারাক আরও আছে, সে দেশে প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস শুরু হয় সকাল ন'টা থেকে পৌনে দশটার মধ্যে আর শেষ হয় দুপুর দু'টো থেকে পৌনে তিনটের মধ্যে। শুধু তাই নয়, একই স্কুলে এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুরু হয় ক্লাস, এক্ষেত্রেও নেই কোনও বিধিনিষেধ। দিনে সচরাচর তিন থেকে চারটের বেশি ক্লাস হয় না। এক একটি ক্লাস চলে ৭৫ মিনিট করে। প্রতি ক্লাসের পর ১৫ থেকে ২০ মিনিটের বিরতি দেওয়া হয়, যাতে এই সময়ের মধ্যে শিশুরা পড়াটা আত্মস্থ করে নিতে পারে এবং কিছুক্ষণ হাঁটাচলা ও কথাবার্তার মাধ্যমে নতুন উদ্যমে মনোযোগ দিয়ে পরের ক্লাসটায় অংশ নিতে পারে। শিক্ষকদের ক্লাস নিতে হয় দিনে মাত্র ৪ ঘন্টা। ফিনল্যান্ডে ক্লাসপিছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা থাকে গড়ে ১৫ থেকে ২০ জন। হোমওয়ার্কের জন্য বেশি সময় ব্যয় করতে হয় না সেখানকার পড়ুয়াদের। স্কুল শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার জন্য মাস্টার্স ডিগ্রী থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ১০ শতাংশ পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরাই শিক্ষক হিসাবে চাকরির আবেদনের সুযোগ পান। সে দেশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপর। দেখা হয়, একজন শিক্ষকও যেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাজে শিক্ষক বলে মনে না হয়। ফিনল্যান্ডের অভূতপূর্ব শিক্ষা বিপ্লবের পেছনে এই উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটি লক্ষ্যণীয় দিক হল, সেখানে শিক্ষার্থীদের প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষের অগাধ বিশ্বাস। স্কুলে পরীক্ষা নেওয়ার রেওয়াজ খুবই কম। কিন্তু যা শেখানো হয়, তা খুব ভাল করে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়। আর যেহেতু পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক কারোরই দুশ্চিন্তা থাকে না, তাই খুব সহজেই শিক্ষকরা নতুন নতুন মজার বিষয় শেখানোর ঝুঁকি নিতে পারেন। ফিনল্যান্ডের স্কুলগুলোতে পরীক্ষা না নেওয়ার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ মেধা বিকাশের সাম্য নিশ্চিত করা। ইউরোপের অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় ফিনল্যান্ডে খারাপ ছাত্র এবং ভাল ছাত্রের মধ্যে ব্যবধান সবচেয়ে কম। তাই বেছে বেছে ভাল ছাত্র খুঁজে বের করার চেয়ে ফিনিশদের কাছে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে যোগ্য হিসাবে গড়ে

তোলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চাপিয়ে দিয়ে নয়, দায়িত্ববোধ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াটাই তাদের মূলমন্ত্র। ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে আলাদা এবং খানিকটা অদ্ভুতও বটে। কড়া অনুশাসন কিংবা নিয়মনীতির বেড়াজালের বাইরে গিয়েও যে সফল হওয়া যায় ফিনিশরা সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

২০০১ থেকে ২০০৯, একটানা ন'বছর ফিনল্যান্ড PISA (Programme for International Student Assessment)-এর তালিকায় শীর্ষ স্থানে ছিল। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার মান যাচাইয়ে PISA খুব জনপ্রিয় একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি। গণিত, বিজ্ঞান ও পঠন অভ্যাসের উপর সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে এই মূল্যায়নটি করা হয়। তবে মজার ব্যাপার হল, খোদ আমেরিকার অবস্থান এই র্যাঙ্কিংয়ে অনেক পেছনে। তাই আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের শিক্ষাগবেষকদের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় হল, ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা।

সামান্য হলেও উপরের আলোচনা থেকে ফিনল্যান্ডের স্কুল, ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষকদের পাঠদানের পদ্ধতি এসব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল। তাই এবার নিশ্চয় খুব স্বাভাবিকভাবেই জানতে ইচ্ছা করছে, ফিনল্যান্ডের পাঠক্রমটা ঠিক কেমন ? তিনটি প্রধান ধারণার উপর ভিত্তি করে ফিনল্যান্ডের বর্তমান পাঠক্রম পদ্ধতিটি তৈরি হয়েছে: - ১) আইন ও 'ন্যাশনাল কোর কারিক্যুলাম'-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পরিচালনা ২) শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও তার ব্যবস্থাপনায় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের স্বশাসন: স্থানীয় স্তরে স্থানীয় পাঠক্রম এর প্রমাণ ৩) শিক্ষকদেরকে শ্রদ্ধেয়-মূল্যবান বিশেষজ্ঞ হিসাবে ব্যবহার করা, যারা স্কুলকেন্দ্রীক বিভিন্ন কাজকর্মের উৎসরূপে স্কুলভিত্তিক পাঠক্রম তৈরি করবে (দ্য ফিনিশ ন্যাশনাল বোর্ড অফ্ এডুকেশন,২০১১)।

ফিনল্যান্ডে জাতীয় মূল পাঠক্রম বা ন্যাশনাল কোর কারিক্যুলাম মূলত স্থানীয় পাঠক্রম তৈরি করার একটি রূপরেখা মাত্র। এর দুটো অংশ আছে। যার মধ্যে রয়েছে সব বিষয়ের মূল সারবস্তু ও উদ্দেশ্য, যা আবার ব্যাখ্যা করেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য, মূল্য এবং কাঠামোকেও। পাশাপাশি এই পাঠক্রমে উঠে এসেছে শিক্ষার ধারণা এবং শিক্ষার পরিবেশকে উন্নত করতে কোনদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, স্কুলের সংস্কৃতি ও কাজের পদ্ধতির মতো বিষয়ও (দ্য ফিনিশ ন্যাশনাল বোর্ড অফ্ এডুকেশন, ২০১১)। এ কারণেই কোর কারিক্যুলামের দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে: একদিকে এটি প্রশাসনিক চালিকার দলিল, আবার অন্যদিকে নিজেদের পাঠদানের অভ্যাসকে উন্নত করতে শিক্ষকদের কাছে এ হল এক মাধ্যম।

গত চল্লিশ বছর ধরে ফিনল্যান্ডে এই ন্যাশনাল কোর কারিক্যুলাম চলছে। ১৯৭০ সালের আগে সে দেশে দুটো সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় ফারাক থেকে যাচ্ছিল, শেখার ক্ষেত্রে একটি বৈষম্য দেখা যাচ্ছিল। এরপর দেশজোড়া বিতর্কের ঝড় ওঠে। যার ফলস্বরূপ ১৯৬৮ সালে 'বেসিক এডুকেশন অ্যাক্ট' তৈরি হয়। যে আইন বলে, সব বাচ্চা তার শিক্ষা জীবনের প্রথম ন'বছর একই স্কুলে পড়বে। ১৯৭২ সালে উত্তর ফিনল্যান্ডে এই আইন মোতাবেক কাজ শুরু হয় এবং ১৯৭৬ সালের আগেই এই নয়া শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে যুক্ত করে দেশের দক্ষিণ প্রান্তেও শুরু হয় শিক্ষার সংস্কার (দ্য ফিনিশ ন্যাশনাল বোর্ড অফ্ এডুকেশন, ২০১০)। তবে এর আগেই ১৯৭০ সালে ফিনল্যান্ডে প্রথম জাতীয় পাঠক্রম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এর সংস্কারও হয়েছে। শিক্ষাকে আরও উপযুক্ত করে তুলতে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষকদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ,শিক্ষাব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ তারই প্রমাণ। তবে শিক্ষার উন্নতিতে সবচেয়ে ইতিবাচক ও ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল ১৯৯৪ সালের জাতীয় পাঠক্রমে, যেখানে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে।

কিন্তু বাস্তবে কীভাবে চলে ফিনল্যান্ডের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা? এই ব্যবস্থায় কীভাবে কাজ করছে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলো?

ফিনল্যান্ডে জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন দুটি স্তরে কাজ করে। শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাজ। আর জাতীয় সংস্থা, ফিনিশ ন্যাশনাল বোর্ড অফ্ এডুকেশন ওই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে। তবে এই সংস্থা শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং একেবারে শৈশবে তার পদ্ধতি, প্রাক-প্রাথমিক, বেসিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বয়স্ক শিক্ষার উন্নতিকল্পে মন্ত্রকের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। স্থানীয় প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়িত্বে থাকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সাধারণভাবে মিউনিসিপ্যালিটি অথবা যৌথ মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ। এরা অর্থের বরাদ্দ, স্থানীয় পাঠক্রম, স্কুলে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। স্কুলগুলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করার ক্ষেত্রেও মিউনিসিপ্যালিটির স্বশাসনের অধিকার রয়েছে। তবে স্কুলের অন্য কর্মচারীদের নিয়োগের অধিকার কিন্তু প্রিন্সিপালের।

সকলকে নিয়ে, সকলের জন্য। ব্যতিক্রমী এই শিক্ষাব্যবস্থা ফিনল্যান্ডে সফল হওয়ার পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ ছিল। প্রথমত, দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ৫৪ লক্ষ। পৃথিবীর অনেক বড় শহরের অর্ধেকেরও কম। তাই চাইলেও ফিনল্যান্ডের মতো ক্লাসে কম ছাত্রছাত্রী রাখা অন্য দেশের পক্ষে এক কথায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, গত শতকের ছয়ের দশকেই প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতাজনিত সমস্যার মোকাবিলা করতে জনসম্পদ তৈরিই একমাত্র সমাধান, একথা সে দেশের নীতিনির্ধারকরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্রথমেই শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ফিনিশরা অধিক গুরুত্ব দেন। সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেন এই খাতে। নিঃসন্দেহে অন্য কোনও দেশ এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক সহস্রবার ভাববে। তৃতীয়ত, ফিনল্যান্ডে সব স্কুলই সরকারি এবং শিক্ষা ১০০ শতাংশ অবৈতনিক। কারণ ফিনিশরা শিক্ষাকে একটি লাভজনক বিনিয়োগ বলে মনে করেন। নগদে যার সুফল পাওয়া না

গেলেও, এর দীর্ঘমেয়াদী সুফল রয়েছে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাসত্ত্বেও আমেরিকায় একজন শিক্ষার্থী পিছু সরকার যে টাকা খরচ করে, ফিনল্যান্ড তার চেয়ে ২০ শতাংশ কম অর্থ ব্যয় হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, তবে কেন ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এই আলোচনা ? আসলে দেশকাল ভেদে যে কোনও সমস্যা ও তা সমাধানের পথ হয়তো আলাদা হয়। তবে এমন কোনও ব্যবস্থা, বাস্তবে যার সুফল মিলেছে তার ইতিবাচক দিকগুলো সব সময়ই স্বাগত। তাই ফিনল্যান্ডের মতো শিক্ষাব্যবস্থা ভারত বা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে বাস্তবায়িত করা যায় কিনা সেই ভাবনা আমাদের নয়, একাজ ওইসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারকদের। তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এমুহূর্তে যেটুকু সম্ভব তা হল, শিক্ষক-শিক্ষিকারা জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখার কথা মাথায় রেখে হাতে-কলমে এবং স্থানীয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে পঠনপাঠনকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারেন। অন্যদিকে প্রাপ্ত অধিকার অনুযায়ী, পঞ্চায়েত বা অন্যান্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে স্কুলের দিকে তাদের যথাসম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেই পারে। তাই শিক্ষা-বাগিচায় রঙিন ফুল গাছের বীজ বপন করা আজ আমাদের সকলের কর্তব্য। তাহলে একদিন হয়তো আমাদের দেশেও শিক্ষা হয়ে উঠবে, সকলকে নিয়ে, সকলের জন্য।

দুটি বই, কয়েকটি পৃষ্ঠা
শিক্ষা নিয়ে ইউনেস্কোর পুনর্ভাবনা

নতুন নতুন জটিলতা আর বৈপরীত্যের নিরিখে বদলাচ্ছে আজকের দুনিয়া। এই পরিবর্তনের ফলে তৈরি হয় উৎকণ্ঠা, জন্ম নিচ্ছে চাপা উত্তেজনা। আশা করা হচ্ছে, শিক্ষাকে হাতিয়ার করে ব্যক্তি মানুষ, জনগোষ্ঠী প্রস্তুত হয়ে উঠবে। মানিয়ে নিতে শিখবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে। শিক্ষার সাহায্য নিয়ে এই পরিবর্তনে উদ্দেশ্যে সাড়া দিতে পারবে, প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবে। শিক্ষাকে নতুন করে ভাবা ও শিখনকে উপরোক্ত প্রেক্ষিতে দেখাই এই প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য। ইউনেস্কোর একটি প্রধান কাজ হল, বিশ্বব্যাপী সামাজিক পরিবর্তনের ঘটনাগুলোর সামগ্রিক পর্যবেক্ষণকেন্দ্র হিসাবে কাজ করা। এই কাজের প্রধান উদ্দেশ্য হল, জননীতিমূলক বিতর্ক সংঘটিত করা। এই প্রতিবেদনটি ইউনেস্কোর এই কাজকে মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। এই লেখার সাহায্য নিয়ে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সকলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, মতামত আদানপ্রদান আহ্বান করা হচ্ছে। মানবতাবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা ও উন্নয়ন এই ডাকই পাঠাচ্ছে। এই ভাবনার নেপথ্যে কাজ করছে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জীবনের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন, সকলের জন্য সমান অধিকার, সামাজিক ন্যায়ের প্রতি সম্মান, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মান্যতা দেওয়া, আন্তর্জাতিক ঐক্যতা এবং সুস্থায়ী ভবিষ্যতের প্রতি সকলের দায়বদ্ধতা। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো হল মানবতার মৌলিক উপাদান। ইউনেস্কোর প্রকাশিত দু'টি বইয়ের ভাবনাই মূলত এই লেখাটিতে বিকাশ লাভ করেছে: Learning to Be: The world of education today and tomorrow (1972), the 'Faure Report', এবং Learning: The treasure within (1996), the 'Delor's Report'.

সুস্থায়ী উন্নয়নঃ মুখ্য ভাবনার বিষয়

বিশ্বব্যাপী সাধারণ সমস্যা ও চাপানউতোরগুলোর সমাধান ও নতুন নতুন দিগন্তের উন্মেষের মাধ্যমে সুস্থায়ী উন্নয়নের অস্পৃহা চরিতার্থ করা সম্ভব। আর্থিক বিকাশ ও সম্পদ সৃষ্টির ফলে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের হার কমলেও পৃথিবীজুড়ে বিপন্নতা, আসাম্য, বিচ্ছিন্নতা ও হিংসার বাড়-বৃদ্ধি ঘটেছে। সুস্থায়ী নয় এমন সব অর্থনৈতিক উৎপাদন ও ভোগব্যবস্থার ফলে বেড়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ণ, পরিবেশ ক্ষয়, বৃদ্ধি পেয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যের ঘটনা। গত কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে মানবিধাকার প্রতিষ্ঠাকারী পরিকাঠামো সুদৃঢ় করা সম্ভব হলেও, সেই সংক্রান্ত নিয়মবিধি রূপায়ন করা, সুরক্ষা করা আজও সহজ নয়। যেমন ধরুন, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের সাহায্যে তাদের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায়নের পথে চালিত করা সম্ভব হলেও, আজও তারা জনজীবনে, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে হিংসা–অত্যাচার, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের প্রতি অবিচার প্রতিনিয়ত তাদের অধিকারকে অবমাননা করে চলেছে। একদিকে যেমন, প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে যোগাযোগ মাত্রা বেড়েছে, বেড়েছে আদানপ্রদান সহযোগিতা ও সংহতি; অপরদিকে তেমন, আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বাড়-বৃদ্ধি, পরিচয়ভিত্তিক রাজনৈতিক দোলাচল ও দ্বন্দ্বের রমরমা। এইসব প্রতিরোধ প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার উপায়, শিক্ষা খুঁজে বের করবে। আর এই পথ নির্ধারণের সময় শিক্ষাকে মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়াজুড়ে রয়েছে নানান মতামত-মতবাদ, বিকল্প জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিত্যনতুন অগ্রগতি যেমন, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ, নিউরো সায়েন্সের উন্নয়ন। আর এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করার সময় এসেছে। শেখা-শিখনকে সংগঠিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

শিক্ষার মানবিক দিককে পুনর্সমর্থন

উন্নয়নের ছুঁড়ে দেওয়া সব বাধাবিপত্তিকে শিক্ষা এককভাবে সমাধান করতে পারবে না। কিন্তু শিক্ষার মানবিক ও সামুদায়িক

বৈশিষ্ট্য দু'টি অবশ্যই এক নতুন ধরনের উন্নয়নের মডেল তৈরি করতে পারবে। এই নতুন মডেল অনুসারে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে পরিবেশ সচেতনতার তত্ত্বাবধানে। এই মডেলে গুরুত্ব পাবে, শান্তি, অন্তর্ভূক্তি ও সামাজিক ন্যায়। মানবতাবাদী উন্নয়নের নৈতিকতায় ও নীতিতে প্রাধান্য পাবে হিংসা বিরোধীতা, অসহিষ্ণুতা-প্রতিরোধ এবং সকল রকম বৈষম্য ও বর্জন পরিহার করা। ক্ষুদ্র উপযোগবাদ আর অর্থনীতি সর্বস্বতাকে ছাপিয়ে যাবে এই শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়া। এই শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়ার ছায়ায় আবৃত হবে মানবসত্তার সকল মাত্রা, সকল বিস্তার. সব ধরনের মানুষ এই শিক্ষায় গৃহীত হবে - নারী ও কন্যা, দেশজ মানুষ, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ, দেশান্তরী মানুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিবাদে লিপ্ত দেশের মানুষজন, এরজন্য চাই মুক্ত ও নমনীয় শেখা-শিখন প্রক্রিয়া, যা জীবনজুড়ে চলবে, জীবনব্যাপী চলবে। সুস্থায়ী ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে; জীবনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রত্যেকে যাতে তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারেন এই শিক্ষাব্যবস্থা ও শিখন প্রক্রিয়া তার সুযোগ করে দেবে।

মানবতাধর্মী শিক্ষাব্যবস্থায় নিহিত থাকবে কী শেখানো হবে, তার সংজ্ঞা কীভাবে শেখানো হবে, তার পদ্ধতি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌দের ভূমিকা। নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতির ফলে এটা থাকাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পৃথিবীজুড়ে এই জটিল পরিস্থিতিতে স্থানীয়স্তরে ও সামগ্রিকভাবে নীতি নির্ধারণ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরে যেভাবে জটিলতা বাড়ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে সকলের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা বেশ সমস্যার বিষয়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে কর্মনিযুক্তি-বৃদ্ধি ক্রমশ হ্রাস ঘটেছে, যুব দলে বেকারত্ব বাড়ছে ও কর্মক্ষেত্রে বিপন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল কাজের দুনিয়ার যোগ কমছে বলেই এমন একটা ধারা দেখা যাচ্ছে। তেমনই শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের যোগটা নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে, এটাও আমাদের বুঝতে হবে। এছাড়াও নিজেদের দেশের সীমান্ত পেরিয়ে পড়ুয়া এবং কর্মীদের চলে যাওয়ার যে প্রবাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেভাবে জ্ঞান ও দক্ষতা আদানপ্রদানের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, শেখা-জানাকে নতুনভাবে নতুন উপায়ে চিনতে হবে, বলবৎ করতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে। পৃথিবীজুড়ে সব দেশগুলোকেই তাদের নাগরিত্ব সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নাগরিকের পরিচয় চিহ্নিত করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাগুলো সমস্যায় পড়বে। নিজস্ব নাগরিকত্বের পরিচিতি নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন থাকতে হবে দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক আর আন্তঃনির্ভরতার কথা। নিজস্ব নাগরিকের পরিচয় তৈরি করার সাথে সাথে অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, সেই সচেতনতাকে উৎসাহিত করতে হবে। গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ যত বেড়েছে ততই তার চাপ পড়েছে জনসাধারণের রাজস্বে। লোকহিতকর কাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি শক্তির অংশগ্রহণের দাবী সাম্প্রতিককালে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এই ছবিটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অংশীদারীত্বের ফলে সরকারি আর বেসরকারি ব্যবস্থার মধ্যেকার সীমারেখা ক্রমশ আবছা হয়ে যাচ্ছে। এরফলে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসনে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এক কথায়, সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী তিনটি সূচক: সমাজ, রাষ্ট্র ও বাজার – এদের অবদান ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ক্রমশ জরুরি হয়ে পড়ছে।

শিক্ষা ও জ্ঞানের সার্বিক ইতিবাচক দিকগুলোকে পুনরায় প্রাসঙ্গিক করে তোলা

ক্রমপরিবর্তনশীল এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাসংক্রান্ত পরিচালনার আদর্শ নিয়ম নীতিগুলোকে ফিরে দেখা দরকার। বিশেষ করে আমাদের নজর দিতে হবে, শিক্ষার অধিকার বলতে কী বুঝি ? আর সঙ্গে সঙ্গে লোকহিতের কারণে শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটাকে আবার করে ঝালিয়ে নিতে হবে। শিক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় আমরা প্রায়শই শিক্ষার মানবাধিকার রূপ নিয়ে কথা বলি, শিক্ষার লোকহিতকর চেহারা ব্যাখ্যা করে থাকি। বুনিয়াদী শিক্ষাস্তরে এই দুটি নীতি নিয়ে কোনও বিতর্ক না থাকলেও বুনিয়াদী শিক্ষাস্তর পার করে যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপর্বে আমরা পৌঁছই সেখানে গিয়ে এই দুটি নীতির প্রয়োগ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক থেকে যায়, যার কোনও মীমাংসা হয়নি। যার বেশিরভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রথাবহির্ভূত ও প্রথাহীন শিক্ষাব্যবস্থা যেগুলো বেশিরভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক, সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আর শিক্ষার লোকহিতকর নীতি দুটি আদৌ প্রয়োগ করা হয় কি? হলেও কতদূর পর্যন্ত করা হয়? শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা হলে তার কেন্দ্রে থাকবে জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা। জ্ঞান বলতে বুঝি, শেখা-জানার সাহায্যে আহরিত তথ্য, কোনও বিষয়কে বুঝতে পারা, দক্ষতা অর্জন, মূল্যবোধ আর মনোভাব বা ধারণা তৈরি হওয়া।

এই লেখার যারা প্রবক্তা তাঁদের মতে, জ্ঞান ও শিক্ষা দুটোকেই সাধারণ-হিতকারী বলে গণ্য করা দরকার। এর অর্থ হল যে, জ্ঞানের সৃষ্টি-তার আহরণ, প্রতিষ্ঠা ও রূপায়ন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তি নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার রয়েছে। সমষ্টিগত সামাজিক প্রচেষ্টার ফল হল জ্ঞান। লোকহিতকারী কথাটা মনে এলেই একটি বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্বের কথা মনে পড়ে যায়। তাই লোকহিতকারীর বদলে এই লেখকেরা সাধারণ-হিতকারী বলছেন, যা ওই লোকহিতকারী তকমাটাকে ছাপিয়ে যায়। সাধারণ-হিতকারী বললে একটা অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার কথা মনে পড়ে। যে প্রক্রিয়ার মধ্যে মিলেমিশে থাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ

পরিস্থিতি, নানান ভাবে ভাল থাকার ব্যবস্থা, জ্ঞানের নানান বাস্তুতন্ত্র। জ্ঞান হল, মানবতার সাধারণ ঐতিহ্য। এই দুনিয়ায় আন্তঃনির্ভরতা যত বাড়ছে, ততই জরুরি হয়ে উঠছে সুস্থায়ী উন্নয়ন। আর এমতাবস্থায় শিক্ষা ও জ্ঞানকে সাধারণের হিতকারী বলে গণ্য করা দরকার। মানবতার আংশদারীত্বে আমাদের সবার সমান ভাগ, সবার সমান অধিকার, আর সেখান থেকেই উঠে আসবে সংহতির মূল্যবোধ। শিক্ষা ও জ্ঞানকে সর্বজনীন সাধারণ-হিতকারী গণ্য করার নেপথ্যে নিহিত রয়েছে বিভিন্ন অংশীদারদের ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা। এবং এই দায়বদ্ধতা ও ভূমিকা ইউনেস্কোর জন্যও প্রযোজ্য। বিশ্বজনীন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে, আদর্শ কর্মনীতির মাধ্যমে ইউনেস্কোর কাজ হল, জননীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে বিতর্ক পরিচালনা করা, উৎসাহিত করা।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে

শেখা বা শিখনকে সমষ্টিগত সামাজিক প্রচেষ্টা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তার লক্ষ্য ও রূপায়ণে সমন্বয়সাধন করা প্রয়োজন। এটা করতে গেলে যে বিতর্ক তৈরি হবে তার প্রথম প্রশ্ন এইভাবে পেশ করা যায়;- শেখার চারটি স্তম্ভ:- জানা, করা, হয়ে ওঠা ও একসাথে বাঁচা। চারটি স্তম্ভ আজও প্রাসঙ্গিক, অথচ বিশ্বায়নের ফলে পরিচয়-রাজনীতির রমরমার ফলে স্তম্ভগুলো আজ আক্রান্ত। কীভাবে এই স্তম্ভগুলোকে মজবুত করে তোলা যায়, পুনর্ণবী করা যায়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত সুস্থায়ীত্বের সমস্যাকে কীভাবে শিক্ষার সাহায্যে সমাধান করা যায়? শিক্ষার মানবধর্মীতা কেমন করে বিশ্বজুড়ে বহু মতামত-মতবাদের সমন্বয় আনতে পারবে? শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাগুলো কীভাবে এই মানবিক শিক্ষাকে তুলে ধরবে? শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় নীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণের বিশ্বায়নের ফলাফল কী? শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থের জোগান, পুঁজি কীভাবে আসবে? শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিকাশ ও সহযোগিতা্র ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ কী হবে? শিক্ষাকে ব্যক্তি হিতকারী, লোকহিতকারী আর সাধারণের হিতকারী- এই তিনভাবে ব্যাখ্যা করলে এই তিনটি সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য কী? পার্থক্যের ফলাফলগুলোই বা কী? শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য গবেষণাকল্পে বিভিন্ন প্রেক্ষিতের বিভিন্ন অংশীদারদের একযোগে আনতে হবে। আন্তর্জাতিক শক্তি হিসাবে, থিংক ট্যাঙ্ক হিসাবে ইউনেস্কোকে এই সাধারণ মঞ্চের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। যে মঞ্চে মুক্ত মনে আলাপ-আলোচনা হবে, বিতর্ক হবে। শিক্ষানীতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে এই মঞ্চে নতুন দিশা তৈরি হবে, যার লক্ষ্য হবে মানব সভ্যতাকে সুস্থায়ী করে তোলা-সর্বসাধারণের ভাল থাকাকে সুনিশ্চিত করা।

শিক্ষায় স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার

শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার পাঠ্যবই ছাড়া অনেক উপকরণই ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি যদি এমন শেখার পদ্ধতি প্রদান করেন যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় (দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ) ব্যবহার করে, তাহলে আপনি শিক্ষার্থীরা যে বিভিন্ন উপায়ে শেখে সেগুলোকে প্রভাবিত করতে পারবেন। আপনার চারপাশে বহু সম্পদ ছড়িয়ে আছে যা আপনি আপনার শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারেন এবং যা শিক্ষার্থীদের শেখায় সহায়তা করতে পারে। যে কোনও বিদ্যালয় স্বল্প ব্যয়ে অথবা বিনা ব্যয়ে নিজস্ব শেখার সম্পদ প্রস্তুত করতে পারে। এই উপাদানগুলো স্থানীয় ভিত্তিতে সংগ্রহ করলে, আপনার শিক্ষার্থীদের জীবন ও পাঠক্রমের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

আপনার আশেপাশে আপনি এমন মানুষ খুঁজে পাবেন যাদের বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে দক্ষতা আছে ; আপনি প্রাকৃতিক সম্পদের বিস্তৃত ভাণ্ডার খুঁজে পাবেন। এটি আপনাকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করবে, এটির মূল্য প্রদর্শন করতে, শিক্ষার্থীদের তাদের পরিবেশের সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য অনুভব করতে উদীপ্ত করবে এবং হয়তো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভিমুখে কাজ করবে – যেটি হল বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে শেখা।

সূত্রঃ www.TESS-India.edu.in

"স্থানীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে স্থানীয় পরিচয়, সত্ত্বা, স্থানীয় অঞ্চলের প্রতি অধিকারবোধ এবং সংযোগ, সব একসঙ্গে মিলে কোনও কিছু উদ্ভাবন করার জন্য সহ্য ক্ষমতা ভাল জীবন গঠনের পক্ষে মূল নির্ধারক হিসাবে কাজ করে" - রয়্যাল সোসাইটি ফর দ্য এনকারেজমেন্ট অফ আর্টস

স্থানীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু উপলব্ধি

আট বছর আগে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের সময় থেকে স্থানীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার একটা উপলব্ধি হয়েছে। সেখানকার দ্বীপগুলো তাদের নিজেদের গুণেই অনন্য। দ্বীপগুলোতে বিভিন্ন ধরনের জৈব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় যেমন, ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য, ম্যানগ্রোভস্, সমুদ্র সৈকত এবং প্রবাল দ্বীপ। এগুলো জৈব বৈচিত্র্যের এক মূল বিষয়, এছাড়া দ্বীপগুলোতে প্রায় বিলুপ্ত বিভিন্ন গাছপালা এবং পশুপাখির প্রজাতিরও খোঁজ মেলে। এসবের পাশাপাশি সেখানে ওঙ্গি, জারোয়া, গ্রেট আন্দামান, শমপেন, শ্যান্ট বেলিস এবং নিকোবরিজদের মতো বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীরও দেখা মেলে। এদের মধ্যে একমাত্র নিকোবরিরা ছাড়া বাকি সমস্ত জনজাতিই প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে।

দ্বীপপুঞ্জে ঘুরতে ঘুরতেই আমি দ্বীপপুঞ্জের খুব আকর্ষণীয় ইতিহাস, ভূগোল, কলা ও সংস্কৃতি এবং বনজঙ্গল সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে পারি। কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্কুলের পাঠ্যক্রম এবং স্কুলের মাষ্টারমশাইদের আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে জানতে পারি স্কুলে যা পড়ানো হয় এবং বাচ্চারা যার মধ্যে বড় হচ্ছে, ওই দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর এক ফারাক।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বর্তমানে কী ধরনের সর্বনাশের সম্মুখীন বা নিজেদের চারপাশের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে স্কুল পড়ুয়াদের কোনওরকম ধারণাই নেই। কেউ এই প্রশ্ন করতেই পারেন, কেন স্কুলের পাঠ্যক্রমের বিষয় এরকম হওয়া উচিত, তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

২০০৪ সালের সুনামির ঘটনা এই গুরুত্বের কথা, আমাদেরকে এর প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেয়। টিলি স্মিথ নামে থাইল্যান্ডের একটি মেয়ে সে সময় অনেক মানুষের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ পড়াশোনার মাধ্যমে সে সুনামি সম্পর্কে জেনেছিল এবং সেই ভয়ঙ্কর স্রোত দেখে সঠিক সময়ে কিছু মানুষকে তা জানানোয় ওই যাত্রায় তারা প্রাণে বেঁচে যায়।

এই দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন বিষয় আমাদেরকে শেখায় কীভাবে দ্বীপপুঞ্জের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের জীবন ও জীবিকার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। যেমন প্রবাল একজীব, তাকে বাস্তু নির্মাণ বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার না করা এবং ম্যানগ্রোভের জঙ্গল বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এছাড়াও এটা আমাদের জানা দরকার যে, বাইরে থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন জীব সব সময় প্রকৃতি রক্ষায় কাজে আসে না। যেমন, Spotted Deer অথবা African giant snail পরিবেশকে সমৃদ্ধ করার থেকে তার ক্ষতিই করেছে অনেক বেশি।

শিশুদের শেখার শুরুটা জানা থেকে অজানার পথে হওয়াটাই সব চাইতে ভাল। এই পদ্ধতি সব সময় সব শিশুকে সমানভাবে শেখার এবং বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। আমরা প্রায় সব সময় এটা ভুলে যাই যে, শিশুরা কত দ্রুত তাদের চারপাশ এবং অভিজ্ঞতাকে নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে আমাকে বুঝতে সাহায্য করে। হিমালয়ের পাদদেশে গ্রামের একটি বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটি আলাপচারিতার সময় খুবই সন্দিহান ছিল, এই জেনে যে, আমি যে জায়গায় থাকি সেখানে কোনও পাহাড় নেই। আমার কাছে এর পরের প্রশ্নটা ছিল, তাহলে তোমাদের ওখানে সূর্য ওঠে কোথা থেকে? আসলে সে সবসময় দেখে এসেছে যে, সূর্যের উদয় হয় পাহাড়ের কোল থেকে।

অন্য এক ভৌগোলিক অবস্থানে লাদাখের শীতল মরুভূমিতে ভ্রমণ আমাকে আরও ভালভাবে একথা বুঝতে সাহায্য করেছিল। আবারও বুঝতে পেরেছিলাম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই প্রাসঙ্গিক শিক্ষা।

যেহেতু বন্যজন্তুর প্রতি আমার সাধারণ আকর্ষণ ছিল তাই ভ্রমণের প্রথম পর্যায় আমি দশম শ্রেণির একদল ছাত্রদের কাছে লাদাখের বন্যজন্তু সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। ছাত্ররা আমাকে অবাক করে দিয়ে উত্তর দিয়েছিল "বাঘ"। আসলে এর কারণ প্রথম থেকেই ছাত্রদের শুধুমাত্র বাঘ এবং সিংহ সম্পর্কেই জানানো হয়েছে, তাদের স্কুল ঘরের দেওয়ালে টানানো ছবির মধ্যে খালি দেখা যায় হাতি, জিরাফ, জেব্রা এবং গণ্ডার। তারা তাদের সম্পূর্ণ স্কুল জীবনে কোনওদিন Snow Leopard, marmots on Blue Ships সম্পর্কে শোনেইনি। তাদের স্কুলের বইও তাদের তা শেখায়নি Ladakh Urial এক বিশেষ ধরনের ভেঁড়া যা শুধুমাত্র লাদাখেই পাওয়া যায় বা তা সম্পর্কে গর্ববোধ করতে। Tibetan Antelope এক জীব, যার পশম থেকে সুতো হয় এবং তা ব্যবহার করা হয় "সাহুতুস শাল" (Shahtoosh Shawl) তৈরি করতে।

পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা শুধুমাত্র তাতে যা নেই তারমধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাতে কী কী রয়েছে তাও অনেকক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। যেমন, জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী তৈরি,

চতুর্থ শ্রেণির EVS-এর পাঠ্যসূচির একটি অধ্যায় "পরিবেশযত্ন ও রক্ষা", যার কিছু অংশ কোনওভাবেই সবার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয়, যেমন পরিবারের সকলে আলাদা আলাদা গাড়ি চালান, খালি ঘরে ফ্যান চালিয়ে রাখা ইত্যাদি যা লাদাখের মতো অঞ্চলে কোনওভাবেই প্রযোজ্য নয়, কারণ সেখানে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী হেঁটেই স্কুলে যায়, সবার বাড়িতে জলের সুবন্দোবস্ত নেই এবং একমাত্র বৈদ্যুতিক যন্ত্র Room Heater, যা শীতের সময় ঘর গরম রাখতে ব্যবহার করা হয়, আবার খাদ্য পুষ্টির যে তালিকা সেখানে রয়েছে তা লাদাখের শিশুদের কোনও কাজে লাগবে না, কারণ সেখানকার বাচ্চারা যা খায় তা ওই তালিকায় নেই।

আসলে একটি শিশু, যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১,০০০ ফিট উচ্চতায় বসবাস করে তার পক্ষে কখনই খুব সহজে এটা মেনে নেওয়াও সম্ভবপর হয়ে উঠবে না যে, বেশিরভাগ পাঠ্যপুস্তককেই লাদাখ সম্পর্কে কিছু লেখা থাকে না। আর যদিও থাকে তবে তাও খুব ত্রুটিপূর্ণ। যেমন, মরুভূমি অঞ্চল, গাছপালা না থাকা, সমস্ত বসতি সিন্ধুনদের ধারে ইত্যাদি।

এই দূর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিকে শোধরানোর জন্য সেখানকার সরকার এবং 'SECMOL' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে 'অপারেশন নিউ হোপ' (ONH) নামক এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ইংরেজি EVS-কে স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বই তৈরি করা হয়েছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইটি প্রকাশ করেছে জম্মু-কাশ্মীর বোর্ড। এই বইগুলো ২০০৩-২০০৪ সালে লে জেলার জন্য ছাপানো হয়েছিল। তবে এখন বইগুলো প্রতিটি সরকারি স্কুলেই পড়ানো হয়।

বইগুলোয় একবার চোখ বোলালে বোঝা যায়, লাদাখের বাচ্চাদের জন্য তা কতটা প্রাসঙ্গিক। যেমন, লাদাখের জঙ্গলের গাছপালা, জীবজন্তু, খামারের জীবন, লাদাখের ঐতিহাসিক জায়গাসমূহ, কিছু ঐতিহাসিক পাহাড় প্রভৃতি।

আগের দু'টি উদাহরণ আমাদের সামনে উঠে এসেছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যযুক্ত অঞ্চল থেকে। তবে জানা থেকে অজানার পথে যাত্রায় যে কোনও ক্ষেত্র, শহর, গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জানাটাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক কতটা স্থানীয় হবে, ভারতের মতো একটা দেশে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা বৃথা। পাশাপাশি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন, কারণ আমাদের দেশে নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধান। তাই তাদের বিভিন্ন কলা সংস্কৃতি ও সবকিছুকে এক জায়গায় নিয়ে এসে এককথায় বলাটা খুবই সমস্যার। কিন্তু আমাদের লেখক, শিক্ষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের ভাবতে হবে কীভাবে সবচেয়ে ভালভাবে এই সমস্যার এক সুষ্ঠু সমাধান করা যায় এবং যাতে করে স্কুলশিক্ষাকে আরও বেশি করে ছাত্রদের ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করা যায়।

সূত্রঃ www.teachersofindia.org
লেখকঃ সুজাতা পদ্মনাভন
প্রথম প্রকাশঃ টিচার প্লাস' আগস্ট ২০০৭

ভেতর ও বাইরের সংযোগই উন্মুক্ত শিক্ষার নির্যাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি স্কুল তৈরি করেছিলেন কেন? তাঁর উত্তর ছিল যে, তিনি তাঁর ক্ষুদ্র সময়ের স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অতিশয় বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁর স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা বড় দেওয়াল, বড় জানালা এবং বেঞ্চের সমাহারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাই তিনি চেয়েছিলেন বাচ্চাদের এক স্বাধীনতা এবং প্রকৃতির স্বাদ দিতে। প্রকৃতপক্ষে স্কুল সব সময় এক বদ্ধ পরিবেশের নামান্তর হয় মাত্র, যা শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। আসলে স্কুল ঘরের বদ্ধজীবন এবং গ্রামের খোলা পরিবেশের মধ্যে এক বিস্তর তফাত সব সময় বিরাজমান।

স্কুলে সব সময় দৃশ্য এবং অদৃশ্য বিভিন্ন স্তর দেখা যায় যেমন- স্কুল বিল্ডিং, স্কুলের ছাত্র শিক্ষক, তাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, তাদের বিভিন্ন আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং সব শেষে বাইরের জগৎ, তার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, পারিপার্শ্বিকের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি। মানব শরীরের মতই স্কুলের ভাবাবেগ এবং সহ্য করার এক ক্ষমতা থাকে, যা বিভিন্ন সংযুক্ত বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল এবং মানব শরীরের মতই তার ভেতর এবং বাইরেটা এক পাতলা চামড়ার মাধ্যমে একে ওপরের থেকে আলাদা। বিখ্যাত ইতালিয়ান লেখক প্রাইমো লেভি (Primo Levi) বলেছিলেন, এই পারিপার্শ্বিক যা আমার বোধের অনেক গভীরে প্রোথিত, যেমন, এই পাখি, এই দিনরাত্রির খেলা, এই প্রজাপতি, পাখি, ঝিঁঝিঁ পোকা, শ্যাওলা .... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনই বাস্তুতন্ত্রের কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর ধারণায় শিক্ষা হল মানব জীবনের পরিবেশের এবং তার পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কে মানুষের ধারণা।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমি যখন বেঙ্গালুরুর পাশে সিলভেপুরা নামক এক গ্রামে যাই তখন দেখি যে সেখানকার বেশিরভাগ বাচ্চাই স্কুলে যেত না অথচ রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, শ্রমিক এদের বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী। আমি ভাবতাম স্কুল কি সত্যি সেই সব বাচ্চাদের জন্য এক বদ্ধ পরিবেশ

হিসাবে সামনে আসবে। কারণ স্কুলের অভিজ্ঞতা গ্রামের অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেকক্ষেত্রে অন্যরকম, মানে তা গ্রামের বাড়ির ভেতরে যাওয়া, বাইরে যাওয়া এমনকি গ্রামের বাইরে, ভেতরে যাওয়ার থেকেও অনেকটাই আলাদা। এই কারণেরই স্কুলগুলোকে এভাবেই তৈরি করা হয়েছিল যেখানে স্কুলের বাইরে এবং ভেতরে, প্রত্যেকটি জায়গাই সবার কাছে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে যাতে তারা প্রত্যেক জায়গা থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে এবং এই কারণেই স্কুলের ভেতর এবং বাইরে যাওয়া-আসার পথটাকে এতটা সুগম করা হয়।

খুব যথাযথভাবেই স্কুলের চারপাশের পরিবেশ ও তার বিল্ডিং এসব কিছুই ছাত্রছাত্রী এবং জগতের সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে। এই চিন্তাভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভিনগ্রহের এবং দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা হিসাবে বর্ণনা করা যায় কিন্তু এই চিন্তাভাবনার মধ্যেই খেলার মাধ্যমে কাজের এক সুন্দর চিন্তার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা খুব সচেতনভাবেই এমন এক অবস্থার কথা চিন্তা করতে পারি যেখানে ভিতরটা বারান্দা, নিচু দেওয়াল, জালি কাজের মাধ্যমে বাইরের কাজের জায়গা থেকে আলাদা করা থাকবে না। বিরুৎ শ্রেণির উদ্ভিদ আমরা দেওয়ালের গায়ে তৈরি করতে পারি, খেলাধূলার জন্য এক ছায়াময় জায়গা তৈরি করা যায়, খেলার সরঞ্জাম এবং বইকে বাচ্চাদের কাছে আরও বেশি পৌঁছে দেওয়া যায়, এমনকি বাচ্চারা স্কুলের সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে আরও বেশি যুক্ত হতে পারে। খালি দেওয়ালকে বাচ্চাদের নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার জায়গা হিসাবে তুলে ধরা যায়, যেখানে বাচ্চারা তাদের সাম্প্রতিক লেখা, ছবি প্রভৃতি লাগাতে পারে যা কোনও নির্দিষ্ট রং করা দেওয়ালের তুলনায় বাচ্চাদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

এক সদা পরিবর্তনশীল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে আমরা কি একথা চিন্তা করতে পারি যে, বাচ্চাদের জন্য এক সঠিক পরিবেশ কী হবে এবং যাতে করে বাচ্চাদের শারীরিক এবং মানসিক গঠন সহজভাবে এবং সঠিকভাবে হতে পারে এবং তারা তার মধ্যে দিয়ে কিছু শিখতে পারে। পুরনো স্কুলবাড়ির জায়গায় নতুন স্কুলবাড়ি তৈরি হচ্ছে কিন্তু তা ভাল থাকার সঙ্গে কতটা সংযুক্ত, তা এক চিন্তার বিষয়। এটাই আমাদের কাছে এখন এক নতুন চিন্তার বিষয় যেখানে নতুন জিনিস দিয়ে এক নতুন নকসা তৈরি করা, যা আমাদের বাচ্চাদের কাছে স্কুলবাড়িকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলবে। গ্রাম বাংলার স্কুলগুলোতে গাছপালা, ফাঁকা জমি প্রভৃতির এক বিলাসিতা দেখা যায় কিন্তু এই বিষয়টিকে বেশিরভাগ সময়ই কোনওরকম গুরুত্বই দেওয়া হয় না। এক সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাচ্চারা কৃত্রিম খেলার মাঠ বা খেলার উপকরণের তুলনায় সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে বড়দের চোখের আড়ালে অনেক বেশি উপভোগ করে। খুবই ব্যাঙ্গাত্বক ভাবে বললে বলা যায় যে, ধনী পরিবারের বাচ্চারা অনেক বেশি বদ্ধ এবং পরাধীন জীবনযাপন করে।

বাচ্চাদের এমন এক পরিবেশে থাকা উচিত যেখানে তারা তাদের জীবনের যোগাযোগগুলো নিজেরাই খুঁজে পাবে এবং যেখানে তাদের জীবন এক ক্ষুদ্রতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। লরিস মালাগুজি (Loris Malaguzzi)-র কথায়, তারা বাচ্চাদের বলেন, এই খেলা এবং কাজ, বাস্তব এবং অলীক, বিজ্ঞান ও কল্পনা, আকাশ এবং পৃথিবী, কারণ এবং স্বপ্ন এমন বিষয় যা একসাথে কোনওভাবেই অবস্থান করে না। স্কুলের পরিবেশ এমন এক জগৎ হবে যেখানে বাচ্চারা সঠিক ভাবে জানতে, বুঝতে এবং ভাবতে হবে।

বাচ্চাদের খেলাধূলা বা অন্যান্য কাজের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যোগাযোগ করানো যায় এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে আরও বেশি যত্নশীল করে তোলা যায়, যেমন যে স্কুলে আমি চাকরি করি সেখানকার বাচ্চারা রোজ সকালে বাগানে বা বাড়িতে যা পাওয়া যায় তার মাধ্যমে স্কুলের ঘরের মাঝখানে এক মন্ডলা (Mandala) তৈরি করে। ঘাস, ফুল, পাতার মাধ্যমে করা নকসা কখনই একরকম হয় না অথচ তারা সময়, ঋতু প্রভৃতিকে দর্শায় এবং বাচ্চাদের মননে এক বোধের সঞ্চার করে। এই কাজ বাচ্চাদের বর্হিপরিবেশে যে পরিবর্তন, তাকে বুঝতে সাহায্য করে এবং শুধু তাই নয়, এই কাজ বাচ্চাদের বিভিন্ন রং,মাপ, আকার, গঠন প্রভৃতি বুঝতেও সাহায্য করে।

বাগান শিক্ষাগ্রহণের এক অমূল্য সম্পদ, যেখানে শুধু খেলেই না বাগান রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও বাচ্চারা গ্রহণ করতে পারে। যেমন বাচ্চারা এখানে জানতে পারে সংরক্ষিত বীজ এবং অন্যান্য বীজের বা চাষের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য, এছাড়াও তারা জানতে পারে বিভিন্ন বর্জ্য সম্পর্কে যেমন কোন বর্জ্য সাধারণভাবে পচনশীল ও কোনটি নয়। এছাড়াও বাচ্চারা জানতে পারবে প্রথম বৃষ্টির পর শ্যাওলার পরিবর্তন বা এখনও পর্যন্ত না দেখা কোনও এক শামুকের প্রজাতি অথবা মাকড়সার জালের ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে পারার ক্ষমতা। এসব কিছুই জানা সম্ভব বাইরের জগতের অভিজ্ঞতা থেকে, তাই বাইরের জগৎ জ্ঞানার্জনের এক সমৃদ্ধ মাধ্যম।

স্কুলকে তার বাচ্চারা ছাড়াও বাইরের জগতের বাচ্চাদের জীবনের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারতে হবে। বাচ্চারা কেবল মাত্র তাদের শরীর নিয়ে স্কুলে আসে না, তারা সঙ্গে

নিয়ে আসে বিভিন্ন চিন্তা, ভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং তার ছাপ। বাচ্চাদের নিজের খবর সংগ্রহ করার ক্ষমতা তৈরি করার ক্ষেত্রে তাদের ডায়রি লেখার অভ্যেস তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চারা ছবি আঁকতে পারে বা তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘটনা লিখে রাখতে পারে। আসলে এই সব বিষয় বড়দের কাছে ভীষণ নিরাশাব্যঞ্জক মনে হতে পারে কিন্তু বাড়ির কোনও ঝগড়া, নতুন কেনা জামা, পোষ্যের জন্ম, না রাখা কথা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া বা বাসে ভ্রমণ করা, এসব কিছুই বাচ্চাদের মনে এক গভীর ছাপ ফেলে। মনের ভাব প্রকাশ করা, ভাবের আদান প্রদান এবং অভিজ্ঞতা একের সাথে অন্যের আদানপ্রদান করার জন্য প্রথম থেকেই ভাষা ব্যবহার করা উচিত। গ্রাম ও বাড়ির পরিবেশ বাচ্চাদের শেখার এক আদর্শ স্থান। শিক্ষার শুরু হওয়া উচিত বাচ্চারা যা জানে তার থেকে এবং পরে তা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত পৃথিবীর ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞানে। যেমন ইতিহাসের ক্লাসে বাচ্চাদের বলা হয়েছিল বাড়ির থেকে নিজের পছন্দের কোনও একটি জিনিস সংগ্রহ করে আনতে। বাচ্চারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস সংগ্রহ করেছিল, যেমন একটি বন্দুক, সেলাই মেশিন এবং একটি ধোঁয়াহীন উনুন। এরপর বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করে, আসলে যা তারা জানতে চায় সেই সম্পর্কে তারা প্রশ্ন তৈরি করে। সেখানে খুব অদ্ভুত সব প্রশ্ন ছিল, যেমন “ভূতকে কি বন্দুক দিয়ে মারা যায় ?” এছাড়াও কিছু চিরাচরিত প্রশ্ন ছিল, যেমন বস্তুটির বয়স তার গঠন বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি। আসলে এই কাজ বাচ্চাদের এক ক্রমতালিকা তৈরি করতে সাহায্য করে এবং যার মধ্য দিয়ে তারা জানতে পারে অতীত কী এবং কীভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করেছে। বাচ্চারা তাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করতে পারে, যেমন বাড়িটা কী দিয়ে তৈরি, তারা কী জামাকাপড় পড়ে, বাড়িতে কী কী ধরনের প্রতিকার উপস্থিত বা কী ধরনের খাদ্য তারা খায়। আসলে এর মাধ্যমে তারা খুব সহজেই বুঝতে পারে যে আমাদের জীবনে আনুষঙ্গিক এমন অনেক বিষয় আছে যা বাইরে থেকে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

সমাজবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, আমরা যেন অতীত নিয়ে খুব বেশি রোম্যান্টিক না হই, আবার ভবিষ্যতকে খুব বেশি সুরক্ষিত করার কথা না ভাবি, তার থেকে ভাল হবে যদি আমরা বর্তমানের সমস্যাগুলোকে বুঝি এবং তা সমাধানের চেষ্টা করি। আমাদের চারপাশের পরিবেশে এবং আমাদের জীবনে গত দশ বছরে বড় দ্রুত গতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমাদের সাংসারিক জীবন, বাচ্চাদের বড় করে তোলার ধরণ, আমাদের খাদ্যাভ্যাস, আমাদের সমস্যা দূর করার ধরণ, এ সব কিছুতেই এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং সমাজ এক আধুনিকীকরণের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। আমাদের চারপাশ এক কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে এক আধা শহুরে অর্থনীতিতে পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে বয়ে নিয়ে আসছে আধা শহুরে অর্থনীতির বিভিন্ন দোষ গুণও।

এই পরিবর্তন আমাদের সবার মনেই বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে এবং বাচ্চারাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বর্জ্য পদার্থের সমস্যা, জলের সমস্যা, স্থানীয় পুলিশের ক্ষমতায়ণ, এইসব সমস্যাকে খুব নিবিড় চিন্তা এবং যথোপযুক্ত উপায়ের মাধ্যমে সমাধান করার কথা চিন্তা করতে হবে। বাচ্চারা ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করা শুরু করতে পারে, তাদের চারপাশের ধান চাষের জমি কীভাবে আবাসন শিল্পের হাত ধরে উধাও হয়ে যাচ্ছে বা জলাজমি কীভাবে ইঁটভাটার দখলে চলে যাচ্ছে তার থেকে।

আগেও আলোচনা করেছি, কীভাবে এক স্কুলে বিভিন্ন স্তর থাকে যা কখনও লুকানো বা অদৃশ্য। স্কুলের ভৌত পরিবেশ ও তার চারপাশ স্কুলের বিভিন্ন দিকের একটা দিক। স্কুলের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যা বেশিরভাগ সময় চোখের আড়ালে থেকে যায়, কিন্তু স্কুলের দর্শনের দিক থেকে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলের বাচ্চাদের শিক্ষা কী হবে তা গভীরভাবে নির্ভর করে কীভাবে সম্পর্ক ও ভূমিকাগুলোকে সম্পাদন করা হয়, একে অপরের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল এবং কতটা দায়িত্বের সাথে সম্পর্কগুলোকে সম্পাদন করা হয়, স্কুলের বিভিন্ন কাজ কীভাবে সম্পাদন করা হয় তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। স্কুলের দর্শন কী প্রকাশ করে, চাপ, নিয়ন্ত্রণ এবং একঘেয়েমি না স্বাধীনতা, খোলা মন ও চিন্তার স্বাধীনতা।

স্কুলের দর্শনের একটা পর্যায় বোঝা যায় যে, কীভাবে এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে; কে কথা বলছে, কাকে বলছে এবং কেন বলছে? যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, লেখা হচ্ছে কিংবা বাচ্চারা শুনছে, বাচ্চারা তা আদৌ বুঝতে পারছে কিনা বা তার সাথে কোনওরকম সংযোগস্থাপন করতে পারছে কিনা? বাচ্চাদের সময় ও সুযোগ দরকার নিজেদের ভালভাবে প্রকাশ করার জন্য, তা ছবির মাধ্যমেই হোক বা কথার মাধ্যমে। চটজলদি উত্তর বা তুলনামূলক তাৎক্ষণিক উত্তর চাইলে তা শুধুমাত্র অন্য কারো কথার অন্তঃসারশূন্য পুনরাবৃত্তি ব্যতিত আর কিছুই হবে না।

ব্রিটিশ উপন্যাসকার ফিলিপ পুলম্যান (Philip Pullman)-এর কথায়, নতুন কিছু তৈরি করার প্রক্রিয়া অনেকটা রাতের বেলায় মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরার মতন, যেখানে সময়, নিস্তব্ধতা, ঝুঁকি এবং ধৈর্য্য সব কিছুই সামিল কিন্তু তবুও ফলাফলটা অজানা। শিক্ষকদেরও বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ছাত্র তৈরি করাটা অনেকটাই এইরকম। কোনও বস্তু তার প্রয়োজন অনুযায়ী মাপা হয় এবং তার পরবর্তীতে মাপা হয় শিক্ষকতার সার্থকতা বা কার্যকরী শিক্ষা প্রক্রিয়ার সার্থকতায়।

একটি বাচ্চা ভাষা ব্যবহার করতে শেখে কোনও কথোপকথনের মাধ্যমে এবং কথোপকথনের মধ্যেকার কোনও বিশেষ কথাকে কেন্দ্র করে এরপর তারা শেখে নিজেদের কথা

বলতে, নিজেদের গল্প শোনাতে। একইরকম ভাবে চোখের ভাষা শেখার ক্ষেত্রেও বাচ্চারা বাইরের জগতের বিভিন্ন বস্তুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে শেখে। কলা মানে শুধু জিনিস বানাতে শেখা নয়, এটা শেখায় দেখতে, শুনতে এবং স্পর্শ করতে। এটা শুরু হয় বস্তু, মানুষ এসবের সাথে গ্রহণমূলক এক সম্পর্কের মাধ্যমে।

বিশিষ্ট ওই উপন্যাসকার বলেছিলেন, কোনও কোনও সময় আমাদের এমন সময় ও জায়গার দরকার যেখানে আমাদের কেউ কোনওভাবে বিরক্ত করবে না। আমরা এটা ভাবতে পারি না যে, আমাদের বাচ্চাদেরও একইরকম সময়ের দরকার, একটি ছবি আঁকতে অথবা একটা অঙ্কের সমাধান করতে। অথচ বাচ্চারা আমাদের অবাক করে দিতে পারে তাদের মনোসংযোগের ক্ষমতা দিয়ে। আমরা বাচ্চাদের কিছু জিনিস কখনই দিতে চাই না তা হল, তাদের স্বাধীনতা বা নিজের আচার-আচরণের স্বাধীনতা, জায়গা, সময় ও বিষয়বস্তু। আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যা সব সময় ঠিক করে শিক্ষকরা। কে কী করবে, কে কী পড়বে, কতক্ষণ পড়বে, সব কিছুই ঠিক করে দেন শিক্ষকরা। তিন বছর আগে আমরা একটা পরীক্ষা শুরু করেছিলাম, যেখানে বাচ্চাদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হবে। "স্বাধীন পছন্দ" (Free choice)-এর নিরিখে ঠিক হয়, প্রত্যেক শুক্রবার তারা নিজেদের ইচ্ছেমত একটা কাজ ঠিক করবে। কার্যাবলীর মধ্যে ছিল নাটক, রান্না, কাগজের বিভিন্ন শিল্প, ছবি আঁকা, মাটির কাজ প্রভৃতি। বাচ্চারা নিজে কাজ করতে পারে, দু'জন একসাথে কাজ করতে পারে, একটা দলে কাজ করতে পারে অথবা নিজের বয়স অনুযায়ী যে কাউকে বেছে নিয়ে কাজ করতে পারে। শিক্ষকদের এই বিষয়ে খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং এই কাজের শেষে তারা একে অপরের কাছে নিজের কাজ সম্বন্ধে জানায় এবং অন্যের কাজ সম্পর্কে জানে।

তবে এই ধরনের স্বাধীনতা সব সময় সব জায়গায় অভিপ্রেত নয়, কোনও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কাছ থেকে খুব পরিষ্কারভাবে কিছু নির্দেশের দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু একটা স্কুল বিভিন্নভাবে তার ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগাতে পারে এবং যা তাদের পক্ষেই হওয়া উচিত, তাদের বিপক্ষে নয়।

স্কুলের ভাল পরিবেশের জন্য আমরা বিভিন্ন স্তরকে একটু অন্যভাবে ভাবতে পারি। এক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, যেখানে স্কুলের ভেতরের এবং বাইরের আবহাওয়ার মধ্যে এক সুষ্ঠু সম্পর্ক তৈরি হবে, যেখানে স্কুলের বাইরের ও স্কুলের ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সংযোগ তৈরি হবে, আমার মধ্যে যা ঘটছে তার সংযোগ গড়ে উঠবে বাইরের পৃথিবীর মধ্যে যা ঘটছে তার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-চিন্তা বলে, শিক্ষার ভিত তৈরি হবে নিজের ভেতরের শিক্ষা এবং বাইরের পৃথিবীর শিক্ষার এক মেলবন্ধনের মাধ্যমে, যাতে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের সাথে সাযুজ্য রেখে এক ভারসাম্যের ভবিষ্যত তৈরি করা যায়।

লেখকঃ জেন সাহি

সূত্রঃ লার্নিং কার্ভ, আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি

হান্টার কমিশন
আধুনিক ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন

হান্টার কমিশন সরকারিভাবে ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন (১৮৮২) নামে পরিচিত। এটি ছিল আধুনিক ভারতের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষা কমিশন। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত এই কমিশনের কাজ ছিল ১৮৫৪ সালের উড-এর শিক্ষা-প্রস্তাবের সময় থেকে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা এবং পরবর্তী অগ্রগতিসাধনের জন্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা। সরকার আরেকটি উদ্দেশ্যে এই তদন্ত শুরু করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং তা ছিল ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগে ইংল্যান্ডে মিশনারিদের বিক্ষোভ পর্যালোচনা করা। সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করার কারণে কমিশনের মূল অংশ থেকে উচ্চ শিক্ষাকে বাদ দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই প্রধানত দৃষ্টি নিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

স্যার উইলিয়ম উইলসন হান্টারকে সভাপতি করে গঠিত ওই কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন আনন্দমোহন বসু, এ.ডব্লিউ.ক্রফট্ (Director of Public Instruction, Bengal), ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ ত্রিম্বক তীলং এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান। অবশ্য সৈয়দ আহমদ খান পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্র সৈয়দ মহম্মদের পক্ষে নিজের নিযুক্তি প্রত্যাহার করে নেন।

কমিশন ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে তার রিপোর্ট পেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এই কমিশনের ছত্রিশটি সুপারিশ প্রাথমিক শিক্ষার মন্থর অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন গতিশীলতা আনয়ন করে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, যখন শিক্ষার প্রত্যেকটি শাখাই যথার্থভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করতে পারে, তখন দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে গণপ্রাথমিক শিক্ষা, এর শর্তাবলী, বিস্তার এবং এর উৎকর্ষকে শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ

হিসেবে ঘোষণা দেওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকারের পূর্বেকার প্রচেষ্টার তুলনায় আরও ব্যাপকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। এই কমিশন সুপারিশ করে যে, (১) প্রাথমিক শিক্ষাকে জনগণের শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়সমূহের ওই শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং তা কোনওক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হবে না; (২) আইনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বিস্তৃতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে; (৩) স্কুলগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে যেখানে দেশীয় স্কুল রয়েছে সেখানে সেগুলোকে সহযোগিতা প্রদান এবং সেগুলোর মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে; (৪) প্রাথমিক শিক্ষাকে জনশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থার ওই অংশ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে, যেখানে শিক্ষা খাতে নির্দিষ্টকৃত স্থানীয় অর্থের উপর এর প্রায় একচেটিয়া দাবি রয়েছে এবং প্রাদেশিক রাজস্বের উপরও তার বড় রকমের দাবি আছে এবং (৫) পৌর ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার (Municipal and Local Self-Government Boards) উভয়কেই স্বতন্ত্র স্কুল তহবিল রাখতে হবে। কমিশনের আরও কিছু সুপারিশ ছিল- যেমন, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, সম্ভবপর স্থানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রামীণ পরিবারের সুবিধানুযায়ী বিদ্যালয়ে অবস্থানের সময় নির্ধারণ, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

REPORT

by

THE EDUCATION COMMISSION

CHAPTER I

INTRODUCTORY

কমিশনের বিশ্বাস ছিল যে, সমাজের সুষম অগ্রগতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মতো উচ্চশিক্ষারও সমভাবে প্রয়োজন আছে এবং এ কারণে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়েও তেইশটি সুপারিশ করে। কমিশন সুপারিশ করে যে, স্থানীয় সমর্থন পাওয়া যাক বা না যাক, প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুলসমূহকে স্থানীয় সহযোগিতা লাভের সাপেক্ষে সমর্থন দিতে হবে। ভারত সরকার এই কমিশনের দেওয়া প্রায় সকল সুপারিশই অনুমোদন করে।

নতুন শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয় শিক্ষার কিছু উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনা

নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'নতুন শিক্ষনীতির' খসড়া। এখানে আলোচনা করব বিদ্যালয় শিক্ষার প্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে। আমরা এখানে পুরোটা তুলে ধরব না, শুধুমাত্র খসড়া নীতির প্রণেতারা যেসব বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলেছেন সেগুলোকেই অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

১) যেসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী কম সেগুলো একত্রিত করে একটি সুসংহত বিদ্যলয় তৈরি করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয় তারজন্য বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিকে যানবাহনের বন্দোবস্ত করতে হবে। ইতিমধ্যে গুজরাট, ছত্তীসগড়, রাজস্থানে কাজ শুরু হয়েছে।

২) শিক্ষকদের দক্ষতামান আরও বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব এসেছে চার বছরের সুসংহত B.A./B.Sc./B.Ed.-এর পাঠক্রম শুরু করার। দুর্গম এলাকাগুলোতে যাতে শিক্ষক পাওয়া যায় তারজন্য নীতি প্রণেতারা DIET-এর পাঠক্রম নতুন করে সাজাতে পরামর্শ দিয়েছেন।

৩) শিক্ষকদের জন্য প্রতি পাঁচ বছরে দু'মাসের জন্য Vacation Training-এর বন্দোবস্ত করার কথা বলা হয়েছে।

৪) SCERT এবং DIET এবং সেই সূত্র ধরে BRC-CRC গুলোর পুনরুজ্জীবনের কথা বলা হয়েছে।

৫) বিদ্যালয় প্রশাসন আগামী দিনের ভারতে একটি খুব জরুরি স্থান নিতে চলেছে। সেজন্য বিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ে নতুন ভাবনা এসেছে যে, বিদ্যালয় প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য প্রযোজন দ্বৈত-প্রক্রিয়া। সেজন্য বিদ্যালয় অধ্যক্ষ নামে একটি নতুন Cadre তৈরির বিষয়ে ভাবনা হয়েছে।

৬) বিদ্যালয়গুলোকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও পারদর্শী করে তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৭) খুব বৈপ্লবিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে RTE আইনের ১২ (১) (সি) ধারা নিয়ে। নীতিনির্ধারকেরা বলেছেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণির জন্য সমস্ত বিদ্যালয়েতো বটেই এমনকি সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোও খুলে দেওয়ার কথা ভাবতে হবে।

৮) বিদ্যালয়স্তরে পাশ-ফেল প্রথা নিয়ে সব জায়গার মতো নীতি প্রণেতাগন আলোচনা করেছেন। এখানে প্রাথমিক স্তরে পাশ ফেল চালু না করে বলা হয়েছে উচ্চ-প্রাথমিক

স্তর হতে এই প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য।

৯) শুধু পাশ-ফেল নয়, CCE প্রক্রিয়া যাতে আরও জোরদার করা হয় তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানোন্নয়নে CCE প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য।

১০) RTE সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক কথা বলেছে নতুন শিক্ষানীতিতে। বিশেষত বলা হয়েছে, যেমন বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য খুব সুকঠোর নিয়ম প্রয়োগ করা হয় তেমনভাবে সরকারি বিদ্যালয়গুলোর সম্পর্কেও দৃষ্টিভঙ্গী বদল হওয়া প্রয়োজন।

১১) Vocational Education নিয়ে খুব সুগভীর আলোচনা হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে। Vocation Education-এর সমগ্র প্রক্রিয়াটি যাতে মূল ধারার Academic System-এর অংশ হতে পারে তার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে।

১২) ICT @ School programme-এর অংশ হিসেবে যেসব বিদ্যালয়ে computer দেওয়া হয়েছিল সেখানে vocational training আরও জোর দিয়ে করার জন্য স্কুল ছুটির পরের সময়টি বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৩) যেসব বিদ্যালয়ের প্রর্যাপ্ত পরিমানে জমি আছে সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। NSDC প্রশিক্ষণ সহযোগীদের একাজে যুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪) বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির পর থেকে যাতে কারিগরী ও জীবিকা সহায়ক পাঠক্রমগুলো করানো যায়, তারজন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছে।

১৫) প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে অনেক গভীর আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলো শুধুমাত্র খেলাধূলো করানোর জন্য নয় বরঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ রচনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার জায়গাও বটে।

১৬) গ্রাম ভারতে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলো যাতে প্রতিটি বিদ্যাল্যগুলোতে তৈরি হয় সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। কারণ তাতে common facility গুলো সবাই পাবে।

১৭) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদর প্রতি এই নীতিপত্র খুব গুরুত্ব দিয়েছে। এখানে State school Act-এর মধ্যে একটি Nodal ক্ষেত্র তৈরির কথাও বলা হয়েছে।

১৮) আদিবাসী জনসমাজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ জোর দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আদিবাসীদের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের হাত থেকে দায়িত্ব শিক্ষা দফতরকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৯) আশ্রম বিদ্যালয়গুলোকে স্থানীয় কোনও একটি ভাল বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

২০) আদিবাসী সমাজে শিক্ষার্থীদের দক্ষতামান বৃদ্ধির উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২১) শরীরশিক্ষার প্রেক্ষিতে যোগা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষত যেখানে খেলার মাঠ নেই সেখানে 'যোগ' সাধনার উপরে জোর দেয়া হয়েছে।

২২) পাঠক্রমের পরিবর্তন এবং পুনর্ভাবনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে বলা হয়েছে, যে এন.সি.এফ.-২০০৫ যাতে ভালভাবে প্রয়োগ করা যায় তার দিকে নজর দিতে হবে। এনিয়ে পৌরসমাজে অনেক আলোচনা চলছে।

২৩) বলা হয়েছে পরীক্ষাব্যবস্থা যেন শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

তবে এইসব প্রস্তাবনাগুলো সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলের ভাল করে পড়ে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। এবং অবশ্যই এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের আগে তা নিয়ে দেশজুড়ে গঠনমূলক বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নবদিশার মাধ্যমে আমরাও আমাদের শিক্ষক বন্ধুদের কাছে এইসব প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করছি।

"আত্মিকতার পথে যাওয়াটাই মানুষ হওয়া নয়, আত্মিকতাকে অবলম্বন করে মানুষ হওয়াটাই উদ্দেশ্য" – রয়্যাল সোসাইটি ফর দ্য এনকারেজমেন্ট অফ আর্টস

জীবজন্তুদের স্কুল পাঠক্রম

এক সময় জীবজন্তুরা ঠিক করল যে, তাদের সমাজে যেভাবে জটিলতা বাড়ছে তারজন্য তাদের অবশ্যই কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তারা একটা মিটিং ডাকল এবং শেষমেশ একটা স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত নিল।

যেখানে পাঠক্রমে জায়গা পেয়েছিল দৌড়ানো, গাছে চড়া, সাঁতার এবং ওড়া। কারণ অধিকাংশ জীবজন্তুর এসবই ছিল সহজাত স্বভাব, তারা ঠিক করল সকল ছাত্রছাত্রীদের এই সব বিষয়গুলো গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

সাঁতারে হাঁস খুব ভালভাবে নিজেকে প্রমাণ করল, বস্তুত যা তার শিক্ষকের চেয়েও অনেক ভাল ছিল। উড়তেও পেরেছিল ভাল। কিন্তু তার দৌড়ানোর মান ছিল খুবই খারাপ। যেহেতু দৌড়ানোর বিষয়টিতে সে খুব খারাপ ছিল, তাই অনুশীলনের জন্য স্কুলের শেষে সে সেখানেই থেকে যেত এবং সাঁতারের চেয়ে দৌড়ানোর অনুশীলনে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল। সে তার খারাপ বিষয়টি নিয়ে এতটাই ভাবিত ছিল যে, যতক্ষণ না তার পায়ের পাতা খুব বাজে ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল ততক্ষণ সে অনুশীলনে মগ্ন ছিল। যার ফলে এবার সে সাঁতারেও সাধারণ মানের হয়ে পড়ল। কিন্তু এই সাধারণ মান স্কুলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল, তাই কেবলমাত্র হাঁস ছাড়া এনিয়ে কেউই ভাবিত ছিল না।

শুরু থেকেই ক্লাসে দৌড়ে সেরা ছিল খরগোস, কিন্তু সাঁতারে ভাল করার জন্য ওই বিষয়ে অধিক সময় দিতে গিয়ে তার মানসিক সমস্যা তৈরি হল, দৌড়ানোকে সে ঘৃণা করতে শুরু করল।

ওড়ার ক্লাসে নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে

জয় করার চেষ্টা শুরু করার আগে পর্যন্ত, গাছে চড়ায় সবচেয়ে পারদর্শী ছিল কাঠবেড়ালি। শিক্ষক যখন তাকে চাপ দেন তখন গাছের উপরের পরিবর্তে সে নিচ থেকে শুরু করে। সে ততক্ষণ পর্যন্ত ওড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল, যতক্ষণ না হতদ্যম হয়ে পড়ল এবং ফলস্বরূপ সে গাছে চড়ায় গ এবং দৌড়ানোতে ঘ পেল।

স্কুলের শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ঈগল; গাছে চড়ার ক্লাসে পরীক্ষার জন্য গাছের উপরটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে সে ক্লাসের সকলকে সে প্রান্ত করেছিল, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে সে নিজের পদ্ধতি মেনে চলছিল।

এরই মাঝে একটি হস্তিশাবক তার বাবার কাছ থেকে কিছু বার্তা পেল।

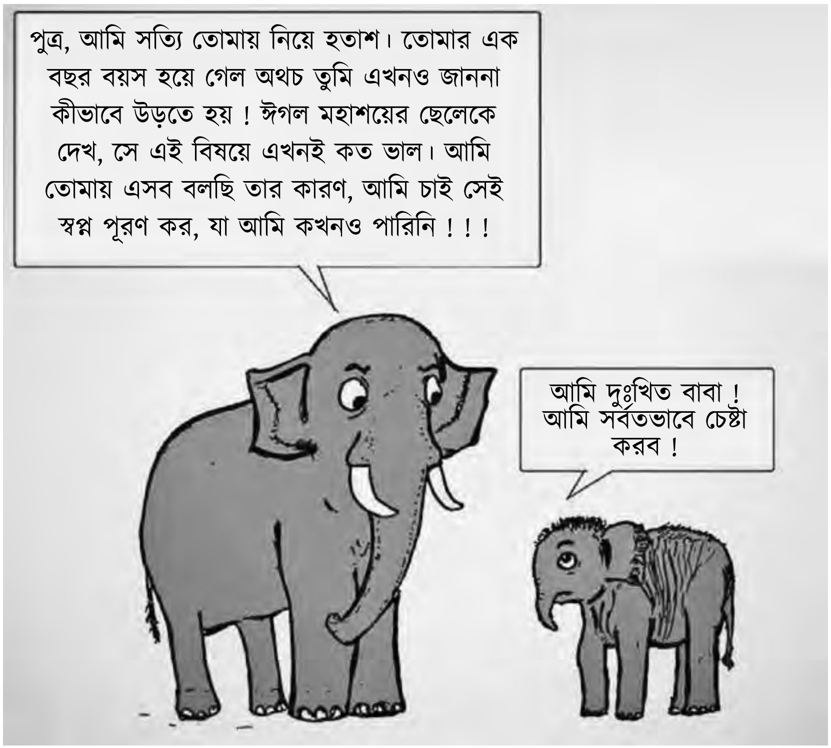

(সৌজন্যে : অ্যাস্ট্রো উলাগামের ফেসবুক পেজ)

ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরা এই স্কুলের বাইরে ছিল এবং শিক্ষায় অতিরিক্ত কর ও খননের কাজকে পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্ত না করার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। এই চাপের মুখে তারা তাদের বাচ্চাদের সাহায্য করল এবং পরবর্তীতে শূকরছানাদের সঙ্গে নিয়ে তারা এক বিকল্প শিক্ষার সন্ধানে এক বেসরকারি স্কুল শুরু করল।

সূত্রঃ টিচার্স অফ ইন্ডিয়া

নবদিশার পথিকদের প্রতি আবেদন

নবদিশার পথিক হয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রথমেই অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, এখনও পর্যন্ত নবদিশার ১১টি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নানান ত্রুটির কারণে হয়তো অনেক সংকলন আপনাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়েছে, হয়তো বা আদৌ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরজন্য আমরা আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থণা করছি। তবে আমরা মনে করি, এই ত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য অবিলম্বে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। আপনাদের সাহায্য ছাড়া যা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। আগামী দিনে যাতে এই নবদিশার এই পথ আরও সুগম হয় তারজন্য আপনারদের সুচিন্তিত মতামতের পাশাপাশি যথা সময়ে পথিক হিসাবে নতুনভাবে ধার্য হওয়া আপনাদের নির্দিষ্ট গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে পুর্ননবীকরণে সহায়তা করুন। এবার থেকে ডাকযোগে এই গ্রাহকমূল্য বছরে ২০০ টাকা এবং হাতেহাতে আপনার এলাকার চিহ্নিত কোনও কেন্দ্রীয় জায়গা থেকে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বছরে ১০০ টাকা গ্রাহকমূল্য দিতে হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত আমাদের অন্য কোনও প্রকাশনা আত্মপ্রকাশ করলে তাও নবদিশার সংকলনের সঙ্গে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি নবদিশায় প্রকাশিত শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলো নিয়েও আপনাদের মতামত আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আপনাদের উপযুক্ত মতামতের মাধ্যমেই নবদিশার পথে এগিয়ে চলা সম্ভব। তাই হবে আমাদের পথ চলার পাথেয়।

আশা করি, এক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সহযোগিতা পাব এবং নবদিশার পথে আমাদের যাত্রাপথ আগামীতে আরও সুগম হবে।

যে কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন এই নম্বরেঃ 8584022177, 8584022181

সম্পাদক, নবদিশা, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্, কলকাতা

রবীন্দ্র চর্চায় শান্তিনিকেতন ও তাঁর শিক্ষা-ভাবনা

নিত্যদিনকার ব্যস্ততার ফাঁকে সেদিন দুটো বই নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছিলাম। যার একটি প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' আর অন্যটি রানী চন্দর লেখা 'সব হতে আপন'। শান্তিনিকেতন নিয়ে অনেক অনেক মহাগ্রন্থের ভিড়ে এই দুটি বই এখনও আমাদের মনে বিশেষ জায়গা নিয়ে রয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের ষিষাদে,দুঃখে,ভালবাসায় এখনও জ্বলে ওঠে প্রতিদিনের নীরব শান্তিনিকেতন। আজ এই হননের সময়ে, যখন প্রতিদিনের ভাবনায় নতুন নতুন আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়, যখন বিদ্যার পণ্যায়ন ভুলিয়ে দিতে চলেছে শিক্ষার মহান দিগন্তগুলো, তখন আরও একবার এই দু'খানি বইয়ের সামনে আমাদের নতজানু হয়ে বসার সময় এসেছে।

'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' প্রকাশিত হয়েছিল বাংলার ১৩৫১ সালে, প্রচুর অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই বইতে যেন মিশে রয়েছে লোহিত মৃত্তিকার দীর্ঘশ্বাস ...... চোখ মেললে যেন দেখা যায় প্রাচীন শালবনের ভিতরে হেঁটে যাচ্ছে একদল সন্ধানী তরুণ।

আমার মনে হয়েছে, প্রতিদিন যারা আমাদের শিক্ষা কী হবে এনিয়ে ভাবেন তাদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে এর কয়েকটা অধ্যায়। যেমন 'প্রাচীন-শান্তিনিকেতন', 'রবীন্দ্র সান্নিধ্য', 'পরিচর্চার আরম্ভ', 'শীতের ভ্রমণ', 'ছাত্র স্বরাজ', 'আশ্রম পরিবার', 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ', 'চোর ধরা' ইত্যাদি। আমাদের জল-মৃত্তিকা-মেঘের গায়ে মেখে থাকা আলো সব নিয়েই তো শিক্ষা। এই বই আমাদের নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে শেখায়। 'নবদিশা'তে আমারা প্রায়শই অনেক শিক্ষকদের বিষয়ে আলোচনা করি কিন্তু এই বইয়ের ১১০ থেকে ১১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যেসব অধ্যাপকদের কথা আমরা পাঠ করেছি তারা আমাদের আবার এই মহান পেশার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। বইয়ের কয়েকটি অধ্যায়ের কথা আরও বিশেষ করে বলা দরকার, 'রবীন্দ্রনাথের গান', 'শান্তিনিকেতনের উৎসব', 'শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক' এবং 'কোপাই নদীর উৎস সন্ধানে'। অসাধারণ......

প্রমথনাথের ভাষা, বাক্য নির্মানের মাধূর্য ......সব মিলিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। আমাদের দ্বিতীয় বই রানী চন্দের 'সব হতে আপন'...এ যেন এক মহাকাব্য ... এখানে আমরা এক ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথের মুখ খুঁজে পাই। তিনি প্রতিদিন এসে তার দৈনন্দিনের ভাবনায় নিজেকে মেলে ধরেছেন। আমরা যারা অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় আপ্লুত হতে চাই তাদের সামনে এই মহাগ্রন্থ যেন এক অনন্ত সরণী। রানী চন্দের মতো আসাধারণ আশ্রমিক যখন তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে এই বই লেখেন তা এক ইতিহাসের জন্ম দেয়। এখানে 'আপন' শুধু শান্তিনিকেতন নয়, এখানে 'আপন' লিখন, এখানে 'আপন' ভাবনা।

মাস্টারমশাই সমীপেষূ পড়ার অভিজ্ঞতা - 'শেখাতে হলে শিখতে হবে'

পলাশী থেকে ফেরার পথে প্রচণ্ড ভিড়ে বাঙ্কে বসে ঝাড়গ্রামের স্বরূপকে একটি বই মনোযোগ সহ পড়তে দেখে অবাক হয়েছিলাম। কারণ সবাই বাড়ি ফেরার তাগিদ আর ট্রেনযাত্রার ক্লান্তি এড়াতে গল্প করছি, মজা করছি। কৌতূহলে ওর থেকে বইটি নিয়ে দু'এক পাতা পড়তেই বুঝলাম কী প্রবল আকর্ষণ রয়েছে বইটির বিষয়বস্তুতে। পরে জানলাম বইটি তপনদার। কাউকে আর বিব্রত না করেই ঠিক করেছিলাম কলকাতার মিটিং-এ তপনদা এলেই বইটি চেয়ে নিয়ে পড়তে হবে। গত দু'দিনে বইটি বেশ কয়েকবার পড়ে মনে হল, এতদিন কেন বইটি পড়িনি। শিক্ষকতা কীভাবে করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের থেকেও শিখে নেওয়াটা কত প্রয়োজন, বইটি পড়ে তা উপলব্ধি করলাম। আর চোখের সামনে আমার শিক্ষকতা জীবনে কত ভুল করে এসেছি তা যেন ছবির মতো ফুটে উঠল। আমার মনে হয় প্রতিটি শিক্ষকের এই বইটি পড়া উচিত। বিশেষ করে আমরা যারা 'শিক্ষা আলোচনা'-র সাথে যুক্ত তাদের সকলের বইটি পড়া একান্ত দরকার।

বইটির নাম " মাস্টারমশাই সমীপেষূ"। লেখক মেচবাহার সেখ। আপনারা যে করেই হোক বইটি সংগ্রহ করে পড়ুন। বইটি সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, ' শেখাতে হলে শিখতে হবে'।

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ)

কৃষ্ণ কুমার- এর লেখা ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

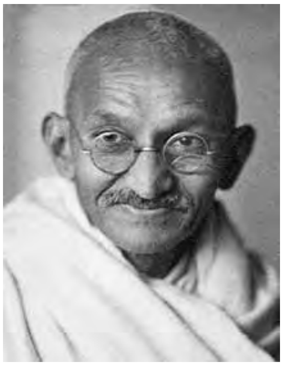

শিক্ষা নিয়ে গান্ধীজীর ভাবনা-চিন্তা তাঁর গভীর জীবনবোধেরই ফসল। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধীতায় মুখর হয়েছিলেন বহু নামজাদা ভারতীয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা করার সাথে সাথে তাঁরা ব্রিটিশ সকারের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাও প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তাঁদের স্বর গান্ধীজীর মতো জোরালো এবং ক্ষুরধার ছিল না। উপনিবেশ প্রথা আর তাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে গান্ধীজী সরব হয়েছিলেন। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হাত ধরে পশ্চিমী- সভ্যতা সত্য ও অহিংসার উপর আঘাত হেনেছে। পশ্চিমী সভ্যতা তার সমস্ত শক্তি, শিল্প, উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে পরদেশ,পরজাতিকে আক্রমণ করেছে, ধ্বংস করেছে, লুটপাট করেছে। গান্ধীজীর কাছে পাশ্চাত্য-সভ্যতা প্রগতির প্রতীক নয়, অনুকরণের আদর্শও নয়। শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। মানুষ বনাম যন্ত্রের দ্বন্দ্ব। মানুষ বলতে তামাম মানবসত্তা। আর যন্ত্র বলতে গান্ধীর কাছে উঠে এসেছে শিল্পোন্নত পশ্চিমী সভ্যতা। যে শিল্প মানুষের স্বায়ত্তকে খর্ব করে। গান্ধীজী প্রণীত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত গাঁথা ছিল স্ব-নির্ভরতায়, আত্ম-সচ্ছলতায়। তাঁর শিক্ষা ভাবনায় উঠে এসেছে এক স্বপ্নরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাই হল গ্রামকে এই লক্ষ্যে উন্নত করে তোলা। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা, গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে উৎপাদনশীল কাজকর্মে। তাদের মধ্যে সেই সব মূল্যবোধ আর আচার-আচরণ চারিয়ে দিতে হবে যা সমবেত-গোষ্ঠী জীবনের অনুকূল হবে। গান্ধীজী যে সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, ঠিক সে সময়টাতে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে এক আলোড়ন। শিল্পায়নের হাত ধরে পশ্চিমী আধুনিকতার ঢেউ আছড়ে পড়ছে ভারতবর্ষের অর্থনীতি-রাজনীতির অলিন্দে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের হাত ধরে ধনতন্ত্রের দৌড় শুরু হয়েছে এদেশে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে শুরু হয়েছে শিল্পায়ন। এই নিরিখে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থান কোথায়? তিনি কী প্রযুক্তি-শিল্পায়ন বিরোধী? নাকি তিনি পশ্চিমী-ধাঁচের আধুনিকতার বিরোধী? যে আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে ইউরোপ ভিন্ন অন্য দেশগুলোকে শোষণ করেছে? আসলে, গান্ধীজী চেয়েছিলেন ভারতের মাটিতে শিল্পায়ন আর ধনতন্ত্রের গতিময়তা কিছুটা হলেও কমুক। তিনি চেয়েছিলেন প্রাথমিকভাবে ভারত সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে উন্নত হয়ে উঠুক। গান্ধী বুঝেছিলেন-দিন যত এগোবে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য-দুনিয়া তার শিল্প-প্রযুক্তি আর পণ্যবাজার নিয়ে ভারতের উপর আছড়ে পড়বে। গ্রাম ভিত্তিক ভারতকে এই চাপ সহ্য করার জন্য রাজনৈতিকভাবে সক্ষম হয়ে উঠতে হবে। এর উপর ভারতের নিজস্ব ধনতন্ত্রবাদী শিল্পপতি, বণিকের দলবলও রয়েছে। সেইজন্য সর্বপ্রথমে চাই তেমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার সাহায্যে ভারতের আপামর জনসাধারণ, গ্রামবাসী আধুনিকতম উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। শিল্পায়নের রকম-সকম এমন হবে যার মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটবে। আর এই মর্মে বুনিয়াদী শিক্ষার ভূমিকাও সুনির্দিষ্ট হবে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না গিয়ে গ্রামের মানুষ, দেশের সাধারণ মানুষের অধিকারে থাকবে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পণ্য। আর ঠিক এই দক্ষতা তৈরি করবে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা। সাধারণ ঘরের শিশুদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটাবে শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই তো স্কুল-পাঠ্যক্রমে উৎপাদনশীল হাতের কাজ অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলেন গান্ধীজী। আর পাঁচটা পাঠ্য বিষয়ের মতো হাতের কাজ শেখাটাই যেন সাধারণ একটা বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়। বরং হাতের কাজ শিক্ষাটি হয়ে উঠবে সমগ্র পাঠক্রমের মেরুদণ্ড। আর এই চিন্তাধারার পিছনে কাজ করছে আবার সেই অনন্য জীবনবোধ, আমূল সংস্কারমনস্কতা। জাতিভেদ-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে নিচু জাতের

ভারতের দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা-দুটোই সেই সব দক্ষতা (যেমন স্বাক্ষরতা) ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছে যা সমাজের উচ্চ-বর্গীয়দের কুক্ষিগত। দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজ-সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চা কোনও জায়গা পায়নি। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম ও সমাজদর্শন সমাজের নিচুতলার শিশুদের পক্ষ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

মানুষেরাই সাধারণভাবে হাতের কাজের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছেন। সুতোকাটা, তাঁতবোনা, মাটির শিল্প, চামড়ার কাজ, ঝুড়ি বোনা, ধাতুর কাজ, বই বাঁধাই, প্রভৃতি উৎপাদনমুখী কাজগুলোর পেছনে যে জ্ঞান লুকিয়ে আছে তা ওই নিচু জাতের মানুষগুলোই কেবল জানে। ওই ধরনের জ্ঞানচর্চা সমাজের নিচু বর্গের মানুষগুলোই করে এসেছে। যাদের মধ্যে অনেককেই আমরা অস্পৃশ্য মনে করে এসেছি। ভারতের দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা-দুটোই সেই সব দক্ষতা (যেমন স্বাক্ষরতা) ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছে যা সমাজের উচ্চ-বর্গীয়দের কুক্ষিগত। দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজ-সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চা কোনও জায়গা পায়নি। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম ও সমাজদর্শন সমাজের নিচুতলার শিশুদের পক্ষ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে সমাজ পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা দিয়েছিল। শিক্ষা বলতে প্রতীকি অর্থে যা বুঝি তাতে বদল ঘটল। আর শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ-সুবিধার প্রচলিত কাঠামোতে বদল ঘটল। গান্ধীজী চেয়েছিলেন স্কুলগুলো যেন স্ব-নির্ভর হয়ে ওঠে। স্বনির্ভরতার পেছনে দুটো যুক্তি কাজ করেছিল। একটা কারণ সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। দরিদ্র সমাজ সকল শিশুর শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করতে অক্ষম হবে, যদি না স্কুল তার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সম্পদ ও আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থা নিজেই না সৃষ্টি করে নেয়। দ্বিতীয় কারণটি রাজনৈতিক। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাই স্কুলকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে পারে। স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বায়ত্ত গান্ধীজীর অত্যন্ত প্রিয় দুটি মূল্যবোধ। আর সত্য ও অহিংসা ভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বায়ত্ত। কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্যের উপর পরনির্ভরশীল হলে তার পক্ষে খুব বেশিদিন ধরে সত্যনিষ্ঠ থাকা সম্ভব নয়। এই ধরনের ব্যক্তি বা সংগঠনকে এমনকি রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হতে হলেও, যার পরিণাম হিংসা অবশ্যম্ভাবী। গান্ধীর শিক্ষানীতির বিপরীত মেরুতে রাষ্ট্রায়ত শিক্ষাব্যবস্থা অবস্থান করে। রাষ্ট্র ও স্কুলের বিরোধ তখনই মেটানো সম্ভব যখন স্কুল তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিজেই সৃষ্টি করে নেবে।

আর পাঁচটা পাঠ্য বিষয়ের মতো হাতের কাজ শেখাটাই যেন সাধারণ একটা বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়। বরং হাতের কাজ শিক্ষাটি হয়ে উঠবে সমগ্র পাঠক্রমের মেরুদণ্ড।

উৎপাদনশীল স্কুলব্যবস্থার কথা কীভাবে মাথায় এলো? জন রাসকিনের লেখা "আনটু দ্য লাস্ট" বইটা পড়েছিলেন গান্ধীজী। তিনটি বার্তা পেয়েছিলেন বইটি থেকেঃ–

১) ভাল অর্থনীতির অর্থ যার ছত্রছায়ায় সবার উপকার হয়।

২) বুদ্ধি বা মানসিক শ্রম থেকে উপার্জিত ধনের মূল্য আর দৈহিক শ্রম করে উপার্জনের মূল্যে কোনও ফারাক নেই। উকিলের ওকালতি থেকে রোজগারের যা মূল্য নাপিতের চুল কেটে যে টাকা উপার্জন হয়, তার মূল্যে কোনও ভেদ নেই।

৩) মজুর বা কারিগর হিসাবে বেঁচে থাকাতেই বাঁচার মতো বাঁচা যায়।

রাসকিনের বইয়ে পড়া বার্তাগুলো বাস্তবে রূপায়ণ করবেন, এরকমই সিদ্ধান্ত নেন গান্ধী। ১৯০৪ আর ১৯১০-এ যথাক্রমে তৈরি করেন ফিনিক্স খামার আর তলস্তয় খামার। গান্ধীজী তখন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী। এই দুই খামারের গোষ্ঠী জীবনে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উৎপাদনশীল স্কুলের বীজ লুকিয়েছিল। তলস্তয়ের মুক্তিকামী চিন্তাধারার অংশীদার ছিলেন গান্ধীজী। তিনি তাঁর শিক্ষাব্যাবস্থার পাঠ্যক্রমের প্রেক্ষিতে শিক্ষকের স্বায়ত্ত অধিকারের কথা বলে গেছেন। ভারতীয় শিক্ষককে আমলাতন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। ঔপনিবাশিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের কাজ হল পাঠ্যপুস্তককে আদ্যন্ত, হুবহু অনুসরণ করে পাঠদান করা। কারণ আমলাতন্ত্র যা চায়, যে জ্ঞান বিতরণ করতে চায় তা ওই পাঠ্যবইয়ের ছত্রেছত্রে ভরে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকের কাজ হল সেই বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। গান্ধীজী শিক্ষকের এই বই-মুখীতা ঘুচিয়ে দিলেন। শিক্ষককে পাঠদানে হতে হবে মৌলিক, যা পাঠ্যপুস্তক দিতে পারবে না। বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষককে স্বাধীনতা দিল। রাষ্ট্রনির্দিষ্ট পাঠদান থেকে তাঁকে মুক্তি দিল। ক্লাসঘরে শিক্ষক স্বাধীনপ্রাণ ব্যক্তি যেখানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চলবে না। গান্ধীজী ক্লাসঘরে, শিক্ষায় ধর্মকেও ঢুকতে দেননি । সকল ধর্ম যে মানবিক সত্যের কথা বলে তা চর্চা করে দেখাতে হবে শিক্ষককে তাঁর প্রাত্যাহিক জীবনে, শিক্ষকের নৈতিকতার উপর এতটাই দাবী করাছিলেন গান্ধীজী। আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদান-প্রদান ঘটবে। শিক্ষক তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের উৎকর্ষতায় শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন, রূপায়িত হয়েছিল দেশের কোণে কোণে। আবার বিরোধীতাও করেছিলেন অনেকে। বিরোধীতা করেছিল তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক মহল। ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে শুরু হয়েছে শিল্পায়ন আর আধুনিকীকরণ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে রাষ্ট্রের উপর। শিক্ষাক্রমে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটেছে। ভারত সাকার করতে চাইছে সেই স্বপ্ন, যেখানে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রই দেশের প্রধান চালিকাশক্তি, যেখানে তৈরি হচ্ছে একের পর এক শিল্প-কারখানা। সবার জন্য উচুঁ মানের বেঁচে থাকার উপায়ের হাতছানি। এসবই তো গান্ধীভাবনার বিপরীত মেরুর জিনিস। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা এতে বেমানান। ভারতের সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়নের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন, শিল্পপতি-রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবি, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী এদের কারোর কাছেই বুনিয়াদী শিক্ষার আবেদন সাড়া ফেলতে পারেনি। বরং ১৯৬০ এর দশকের "উন্নয়ন পরিকল্পনা" বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও দূরে ঠেলে দেয়।

এসো তাঁদের গল্প শোনাই

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

ইতিহাসের পাতায় তিনি শিল্প-রসায়ন ও ভারতীয় রসায়নের জনক। জীবন ছিল খুব সাদামাটা। জমিদার বংশের সন্তান হয়েও তাঁর সাদাসিধে জীবনযাপন দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেতেন।

সেই ব্রিটিশকাল। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি ঘর। আসবাবপত্রের মধ্যে একটি খাটিয়া, দুটি চেয়ার, ছোট একটি খাবার টেবিল, একটি পড়ার টেবিল ও জামাকাপড় রাখার একটি সস্তা আলনা। পড়নে থাকত কম দামের মোটা খোটা ধুতি, চাদর, গেঞ্জি অথবা গায়ে একটি কোট। এক রাশ দাড়িগোঁফ মুখে লোকটির চুলে বোধকরি চিরুনি পড়েনি। সকালে মাত্র এক পয়সার টিফিন। এক পয়সার বেশি টিফিন হলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। অন্যান্য খাবারদাবারও খুব সাদামাটা। অথচ তখন মাসিক আয় হাজার টাকার উপরে। মোট আয় থেকে নিজের জন্য মাত্র ৪০ টাকা রেখে বাকি সব দান করে দিতেন। এই মহান মানুষটিই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, যিনি পি সি রায় নামে পরিচিত। পি সি রায় শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন শিল্পোদ্যোক্তা, সমাজ সংস্কারক, বিজ্ঞানশিক্ষক, দার্শনিক, কবি, শিক্ষানুরাগী, ব্যবসায়ী ও বিপ্লবী দেশপ্রেমিক। তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে 'আমি বৈজ্ঞানিকের দলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী সমাজে ব্যবসায়ী, গ্রাম্য সেবকদের সাথে গ্রামসেবক আর অর্থনীতিবিদ্‌দের মহলে অর্থনীতিজ্ঞ।' দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য যখন যা প্রয়োজন, সেটাই তিনি করেছেন।

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলি গ্রাম। যার পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে কপোতাক্ষ নদ। ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট (বাংলার ১২৬৮ সালের ১৮ শ্রাবণ) এই রাড়ুলি গ্রামেই পি সি রায়ের জন্ম। বাবা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন স্থানীয় জমিদার। তাঁর মায়ের নাম ভুবনমোহিনী দেবী। বাবা তাঁকে ডাকতেন ফুলু বলে। ছোটবেলায় মায়ের নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি, পরে পড়াশোনা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত এম.ই. স্কুলে। চার বছর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কলকাতায় চলে যান। বাবার আগ্রহে ১৮৭২ সালে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু রক্ত আমাশয়ের কারণে তার পড়ালেখায় ব্যাপক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। এই ফিরে আসা তাঁর জীবনে আশীর্বাদ হয়ে উঠে। এই সময় পিতা হরিশ চন্দ্র রায়ের লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করে তিনি সন্ধান পান পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডারের। ১৮৭৪ সালে প্রফুল্লচন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৮৭৮ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। ১৮৮১ সালে সেখান থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি থেকে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। সেখানে তিনি বি.এস.সি. পাশ করেন এবং ডি.এস.সি. ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, `অন পিরিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন্ অফ্ এলিমেন্টস`। দু'বছরের কঠোর সাধনায় তিনি এই গবেষণা সমাপ্ত করেন এবং ১৮৮৭ সালে পি.এইচ.ডি. ও ডি.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন। গবেষণাপত্রটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে ১০০ পাউন্ড 'হোপ প্রাইজ' পুরস্কারেও ভূষিত করা হয়।

১৮৮৮ সালে দেশে ফেরেন পি সি রায়। পরের বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। শুরু হয় তাঁর শিক্ষক, গবেষকজীবন ও বিভিন্ন সামাজিক কাজ। ঘি, সরিষার তেল ও বিভিন্ন ভেষজ উপাদান নিয়েই তিনি প্রথম গবেষণা শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট (HgNO2) আবিষ্কার করেন। যা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি তাঁর অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। এছাড়া পারদ-সংক্রান্ত ১১টি মিশ্র ধাতু আবিষ্কার করে রসায়নজগতে তিনি বিস্ময় সৃষ্টি করেন। গবাদি পশুর হাড় পুড়িয়ে তাতে সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করে তিনি সুপার ফসফেট অফ্ লাইম তৈরি করেন। তাঁর প্রথম মৌলিক গবেষণা খাবারে ভেজাল নির্ণয়ের রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন-সংক্রান্ত। ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট প্রতিনিধি হিসাবে তৃতীয়বারের জন্য তিনি ইংল্যান্ড যান এবং সেখান থেকেই সি.আই.ই. লাভ করেন। ১৮৮৯ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক ছিলেন। এরপর ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯৩৭ সালে ৭৫ বছর বয়সে তিনি যখন অবসর নিতে চাইলেন, তখন তাঁকে আজীবন অধ্যাপক হিসেবে রসায়নের গবেষণাকর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩০ সালে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। ওই একই বছর লন্ডনের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের মহীশুর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান

করেন। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই ১৮৮৫ সালে, ভারত - সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে (India: Before and After the Sepoy Mutiny) এবং ভারত সম্বন্ধীয় বিভিন্ন নিবন্ধ লিখে তিনি এদেশে ও ইংল্যান্ডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পি সি রায় ১২০০ শতাব্দী এবং তারও পূর্বের ভারতবর্ষের রসায়নচর্চার ইতিহাস তুলে ধরে প্রমাণ করেন যখন ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ গাছের ছাল বা বাকল পরে লজ্জা নিবারণ করত, তখন ভারতবর্ষের মানুষ পারদের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত ছিল। বিজ্ঞানের উপর তাঁর ১৫০টি গবেষণাগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন জার্নাল মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। পি সি রায় ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। ছাত্রদের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। তিনি ছিলেন অকৃতদার। ছাত্রছাত্রীরাই ছিল তাঁর সন্তান। তিনি বুঝেছিলেন বাংলায় বক্তৃতা ছাত্রদের অনুধাবনের পক্ষে সহায়ক। তাই ক্লাসে বাংলায় বক্তৃতা দিতেন এবং পড়ার সময় বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী এবং তাঁদের সফলতার কথা তুলে ধরতেন। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল অসাধারণ, তিনি ছাত্রদের মন জয় করে নিতেন খুব সহজেই। বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিয়ে তিনি কলেজেরই দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে থাকতেন। ছাত্ররাই তাঁর দেখাশুনা করত। যে সব ছেলেরা তাঁর কাছে থাকত, তাদেরই একজনের হাতে মাথা রেখে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর, পুলিন বিহারী সরকার, রসিকলাল দত্ত, মেঘনাদ সাহা, শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক, বিজ্ঞানী কুদরত-ই খুদা, হেমেন্দ্র কুমার সেন, বিমান বিহারী দে, প্রিয়দা ভঞ্জন রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল দে, প্রফুল্ল কুমার বসু, বীরেশ চন্দ্র গুহ, অসীমা চ্যাটার্জি প্রমুখ। একবার ফজলুল হক (শের-এ-বাংলা) ৫/৬ দিন ক্লাসে না আসলে একদিন বিকালে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তার বাড়িতে যান। ফজলুল হক তখনও খেলার মাঠে থাকায় তিনি তার জন্য অপেক্ষা করেন। ফজলুল হক ফিরে এসে স্যারকে দেখে, তিনি কতক্ষণ এসেছেন জানতে চাইলে পি সি রায় বলেন, 'তোমাদের হিসেবে এক ঘন্টা আর আমার হিসেবে ষাট মিনিট'। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের নৈতিক স্বাদেশি শিক্ষাতেও দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের বলতেন, 'গরিব মানুষের পয়সায় লেখাপড়া শিখছ, এদের ঋণের বোঝা কিন্তু একদিন ফিরিয়ে দিতে হবে।' ছাত্রদের নিয়ে তিনি বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সব সময়ই আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

একজন বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক

দেশপ্রেম তাঁকে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল। বাংলা ভাষা তাঁর অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল এবং তিনি ক্লাসে বাংলায় লেকচার দিতেন। বৃটিশ গোয়েন্দা দফতরে স্যার পি সি রায়ের নাম লেখা ছিল 'বিজ্ঞানীবেশে বিপ্লবী'। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম পর্যায় থেকেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যখন বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন গোপনে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য তিনি বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করতেন। ১৯১৬ সালে কলকাতায় তিনিই প্রথমবারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর জনসভার আয়োজন করেছিলেন। ১৯১৯ সালে কলকাতার টাউন হলে রাউলাট বিলের বিরোধিতায় আয়োজিত জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন, 'দেশের জন্য প্রয়োজন হলে বিজ্ঞানীকে টেস্টটিউব ছেড়ে গবেষণাগারের বাইরে আসতে হবে। বিজ্ঞানের গবেষণা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না।' গান্ধীজির অনাড়ম্বরপূর্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নিজেকে কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ১৯২৫ সালের জুন মাসে অসহযোগ আন্দোলন প্রচারে গান্ধীজি খুলনায় আসলে, সাতক্ষীরা জেলার তালার সৈয়দ জালালউদ্দিন হাসেমী ও ডুমুরিয়ার মৌলানা আহম্মদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে পি সি রায় স্টিমার ঘাটে তাঁকে স্বাগত জানান। পি সি রায় ছিলেন ওই সম্বর্ধনা কমিটির সভাপতি। ১৯২৫ সালে কোকনাদ কংগ্রেসের কনফারেন্সে সভাপতি মৌলানা আহম্মদ আলির অনুপস্থিতে কিছু সময় স্যার পি সি রায় সভাপতিত্ব করেন। একই সময় পাইকগাছা উপজেলার কাটিপাড়ায় 'ভারত সেবাশ্রম' নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নিজ জন্মভূমির এলাকার মানুষকে চরকায় সুতো কাটার মাধ্যমে স্বদেশি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় একটা চরকা স্থাপন করে তিনি নিজেও সুতা কাটতেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের লবন আইন অমান্য আন্দোলনের খুলনা জেলার স্থান হিসেবে পি সি রায় নিজ গ্রাম রাড়ুলিকে নির্বাচন করেন।

> **'দেশের জন্য প্রয়োজন হলে বিজ্ঞানীকে টেস্টটিউব ছেড়ে গবেষণাগারের বাইরে আসতে হবে। বিজ্ঞানের গবেষণা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না।'**

উদ্যোক্তা পিসি রায়

ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ ও তাদের পণ্যের বাজার। এ দেশের মানুষের নিজস্ব কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল না। পি সি রায় উপলব্ধি করলেন, এদেশকে বাঁচাতে হলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কোনও বিকল্প নেই। তিনি ঝাপিয়ে পড়লেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করতে, যাতে তারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভারত উপমহাদেশে যত নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার সূচনা ওই সময়ের বলেই ধারণা করা হয়। ১৮৯৩ সালে পি সি রায় নিজের ল্যাবরেটরিতে ব্রিটিশ কোম্পানি ফার্মাকোপিয়ার একটি ওষুধ তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন। এ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাত্র ৮০০ টাকা পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড

ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। যা ১৯০১ সালে কলকাতার মানিকতলায় ৪৫ একর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। নিজ জেলা শহর খুলনায় মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন এ.পি.সি. কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ও এ.পি.সি. টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড (পরবর্তীতে খুলনা টেক্সটাইল মিলস্)। ১৯০৬ সালে তিনি রাড়ুলি এবং তার আশপাশের গ্রামের মানুষকে জড়ো করে ৪১টি কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি গড়েন। পরবর্তীতে সমিতিগুলো নিয়ে রাড়ুলি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল অবিভক্ত বাংলায় তৃতীয় ব্যাংক। ১৯২৩ সালে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় তিনি ধর্মগোলা ও সমবায় ভান্ডার স্থাপনের পরামর্শ দেন। ১৯১৭ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল সমবায় সমিতি, ১৯১৮ সালে বঙ্গবাসী কলেজ কো-অপারেটিভ ষ্টোর অ্যান্ড ক্যান্টিন, ১৯২১ বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি সহ অনেক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া একাধিক কাপড়ের মিল ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে, রেখেছেন বিশেষ ভূমিকা।

শিক্ষাবিস্তারে নিবেদিত প্রাণ

পি সি রায়ের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি সম্পত্তি ও তাঁর উপার্জিত সমুদয় অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে, ছাত্রবৃত্তি ও জনহিতকর কাজে দান করে গেছেন। পি সি রায় শুধু নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই প্রতিষ্ঠা করেননি, সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত এমন কোনও প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে পি সি রায়-এর অর্থনৈতিক অনুদান ছিল না। চারটি গ্রামের নাম মিলে ১৯০৩ সালে তিনি দক্ষিণ বাংলায় প্রথম আর.কে.বি.কে. হরিশ চন্দ্র ইনষ্টিটিউট (বর্তমানে কলেজিয়েট স্কুল) প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের রাড়ুলি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন যশোর-খুলনার প্রথম বালিকা বিদ্যালয়, ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়। বাগেরহাট পি.সি. কলেজ তাঁরই কীর্তি। সাতক্ষীরা চম্পাপুল স্কুলও পি সি রায়ের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত। খুলনার দৌলতপুর বি.এল. কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, বরিশালে অশ্বিণী কুমার ইনষ্টিটিউশন, যাদবপুর হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল সহ প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠানে তিনি আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পি সি রায় ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দান করেন। এ সময় ছোট্ট একটি ছেলে, অর্থের অভাবে পড়াশোনা চলেছে না জানিয়ে পি সি রায়কে চিঠি লেখেন। তিনি তখনই পোস্টকার্ড লিখে ছেলেটিকে আসতে বলেছিলেন।

> ‘আমাকে কিনতে হলে তো আমার মাথা কেটে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে আমার মাথা কেটে নিয়ে যান।’

মানব সেবায় পিসি রায়

যেখানেই মানুষের দুর্ভোগ, সেখানেই তিনি। অর্জিত সব অর্থ অকাতরে দান করেছেন। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে পর পর দু’বছর অনাবৃষ্টির কারণে সমগ্র খুলনা (বর্তমান খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা) জেলায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং পরবর্তীতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯২১ সালে গড়ে তোলেন রিলিফ কমিটি। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হলে সেখানেও ছুটে যান তিনি। সেখানকার মানুষকে রক্ষা করতে গঠিত ত্রাণ কমিটিরও সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি।

মানুষের মুখে মুখে নানা গল্প

বিজ্ঞানী পি সি রায়কে নিয়ে তাঁর নিজ গ্রাম ও আশপাশের গ্রামগুলোতে মানুষের মুখে মুখে নানা গল্প প্রচলিত আছে। জানা যায়, তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কেনার জন্য অর্থাৎ ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে তিনি তো ছিলেন দেশপ্রেমিক, সেটা মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি রসিকতার সাথে বলেছিলেন, ‘আমাকে কিনতে হলে তো আমার মাথা কেটে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে আমার মাথা কেটে নিয়ে যান।’ আরও জানা যায়, একবার এক বুড়ি কাটিপাড়া বাজারে লাউ বিক্রি করতে এসে পিসি রায়ের নজরে পড়েন। পরে সেই লাউ গাছের গোঁড়া থেকে তিনি সোনা খুঁজে বের করেন। তিনি প্রায়ই কপোতাক্ষ নদের ধারে কান পেতে শুয়ে থাকতেন। সুন্দরবন উপকুলে অনেক কিছু আছে, তিনি এরও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তা জেনে ব্রিটিশরা নাকি বিশেষ অভিযানও চালিয়েছিল।

ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ

একবার ভারতের অবস্থা জানার জন্য ইংল্যান্ডে একটা কমিশন (সাইমন কমিশন) তৈরি হয়। লন্ডনেই বসেই তারা কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের অনেক সুনাম শুনেছিলেন। তারা আরও জেনেছিলেন বিজ্ঞান কলেজে একজন মনীষী আছেন এবং তারা বিজ্ঞান কলেজ পরিদর্শনে আসতে চাইলেন। একদিন দুপুরে কমিশনের সদস্যরা বিজ্ঞান কলেজে এলে দেখেন পি সি রায় গামছা পরে ধুতিখানা রোদে শুকাচ্ছেন। ঘরে ঢুকে দেখেন এক কোণে স্টোভে রান্না হচ্ছে, অন্যদিকে সাদামাটা একটা খাট। ঘরের মাঝে একটা টেবিল আর একটা সাধারণ চেয়ার। পোশাক রাখার একটা কমদামি আলনা। এ দেখে তাদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। শুধু বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যেও তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। সেক্সপিয়র ছিলেন তাঁর প্রিয় নাট্যকার। হ্যামলেট নাটক গোটাটা মুখস্থ বলতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তাঁর ভক্তি কম ছিল না। তিনি আবার জগদীশ চন্দ্র বসুর সহকর্মীও ছিলেন।

শেষ নিঃশ্বাস

৭৫ বছর বয়সে অধ্যাপক হিসেবে অবসর নেওয়ার পরও আট বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। থাকতেন বিজ্ঞান কলেজের ওই ছোট ঘরটায়। তখন তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল,স্পষ্ট করে কথা বলতে পারতেন না, এমনকি নিজের বিছানা ছেড়ে উঠেও বসতে পারতেন না। যে সব ছেলে তাঁর কাছে থাকত, তাদেরই একজনের হাতে মাথা রেখে তিনি ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন ৮৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সেই সময়

প্রায় দেড়শ বছর আগে A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্রন্থটি লিখেছিলেন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট ২০ টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি তে তৎকালীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান ও জেলার ভৌগলিক বিবরণ সহ সেখানকার অধিবাসীদের জীবন জীবিকা ও তাদের আর্থ সামাজিক চিত্র নানা তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ যেভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে, তাতে তৎকালীন বাংলার জেলা ভিত্তিক যে পরিচয় আমরা পাই – তা আজও প্রাসঙ্গিক ।আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি একবার সেই পুরনো দিনগুলির দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি । এখন দেখা যাক কেমন ছিল সেই সময়।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা

তৎকালীন রাজশাহী কুচবিহার ডিভিশনের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল এই অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা। ৪১২৬ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল এই দিনাজপুর জেলা। ১৮৭২ সালের সেনসাস অনুযায়ী সে সময়কার দিনাজপুরের জনসংখ্যা ছিল পনেরো লক্ষ এক হাজার ন'শো চব্বিশ জন এবং মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ৭১০৮ টি। ওইসব গ্রামে মোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ২৬৪,৫২৬ টি। প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব ছিল ৩৬৪ জন। প্রতিটি গ্রামে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল গড়ে ২১১ জন। এখানে আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৭,৭৬,৪৩১ জন ছিল পুরুষ এবং ৭,২৫,৪৯৩ জন মহিলা। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার হিসেবে পুরুষ ছিল ৫১.৭ শতাংশ। আর ধর্মের নিরিখে যদি মোট জনসংখ্যাকে ভাগ করা যায় তাহলে দেখা যায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৪৬.৮ শতাংশ, আর মুসলমান ধর্মের মানুষ হল ৫২.৮ শতাংশ। এছাড়াও দিনাজপুর জেলায় খ্রিস্ট ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদেরও বসবাসের কথা জানা যায়। হিন্দু ধর্মের মানুষদের মধ্যে যেসব শ্রেণির মানুষদের কথা জানা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, ঘাটোয়াল, বৈদ্য, কায়স্থ, আগরওয়াল, মাড়োয়ারি, ওসোয়াল প্রভৃতি। এছাড়াও সেই সময়ে সদগোপ, নাপিত, কামার, কুমোর, মালি, গোয়ালা, গোঁসাই, তাঁতি, ধোপা, কুর্মি, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রি, বৈষ্ণব, স্বর্ণকার প্রভৃতি পেশার মানুষদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময় মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবি ও ফারাজি শ্রেণির মানুষদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ওয়াহাবি ও ফারাজিদের মধ্যে তখন ধর্মীয় গোঁড়ামি ততটা ছিল না। ওই সময় দিনাজপুর জেলায় আদিবাসী উপজাতি মানুষদের বসবাসের কথাও জানা যায়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার দেওয়ানী লাভ করে তখন এই দিনাজপুর জেলা ব্রিটিশ প্রশাসনের আওতায় চলে আসে। তখন চুরি ডাকাতি ইত্যাদির কারণে দিনাজপুর জেলার পরিস্থিতি ছিল বিভীষিকাময়।

দিনাজপুর জেলার উত্তরে ছিল জলপাইগুড়ি, পূর্ব দিকে রংপুর, পশ্চিমে পূর্ণিয়া এবং দক্ষিণ দিকে মালদা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলার অংশ বিশেষ। দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হত দিনাজপুর শহর থেকে। এই দিনাজপুর শহরটি অবস্থিত ছিল পুনর্ভবা নদীর পূর্ব তীরে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার দেওয়ানী লাভ করে তখন এই দিনাজপুর জেলা ব্রিটিশ প্রশাসনের আওতায় চলে আসে। তখন চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির কারণে দিনাজপুর জেলার পরিস্থিতি ছিল বিভীষিকাময়। কিন্তু সেই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্রিটিশ প্রশাসন অনেকটাই সাফল্য লাভ করে। তবে এই সাফল্যের পেছনে ১৮১৪ সালে দিনাজপুর জেলার তৎকালীন প্রশাসক মিঃ সিসনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। মিঃ সিসন দিনাজপুর জেলায় রাত্রিকালীন পর্যবেক্ষণ বা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থাও চালু করেন।

তৎকালীন দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের কথা জানা গেলেও মৎস্যজীবী মানুষদের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র দুটি গ্রামে। ওই গ্রাম দুটি ছিল কুলিক নদীর তীরে অবস্থিত রায়গঞ্জ এবং ছিড়ামাটি নদীর তীরে অবস্থিত ধানকাইল। কিন্তু ১৮৭০ সালে তখনকার কালেক্টরের রিপোর্টে মৎস্যজীবী মানুষদের সঠিক সংখ্যা কত, তা জানানো অসম্ভব বলেও উল্লেখ করা হয়। কারণ যারা মাছ ধরার পেশায় নিযুক্ত ছিল, তাদের অধিকাংশই আবার সারা বছর চাষবাসের পেশাতেও নিযুক্ত থাকত। তাই মাছ ধরার পেশায় নিযুক্ত মানুষের সঠিক সংখ্যা ওই রিপোর্টে পৃথকভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৮৭২ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী যে হিসেব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় দিনাজপুর জেলার মোট জনসংখ্যার হিসেবে পাঁচ শতাংশ মানুষ মাছ ধরার পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে দিনাজপুর জেলা ছিল কৃষিসমৃদ্ধ জেলা। অর্থাৎ কৃষিই ছিল এই জেলার মানুষদের প্রধানতম পেশা।

সে সময়কার দিনাজপুর জেলায় সারা বছর ধরেই বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় সভা বা অনুষ্ঠানের আয়োজন হত। এরকম কয়েকটি মেলা ছিল, ১) নেকমার মেলা ২) আলাওয়ার খাওয়া

মেলা ৩) ধলদীঘি মেলা ৪) সোন্তাপুর মেলা প্রভৃতি। এরমধ্যে নেকমার মেলাটি হত এক মুসলমান পীরের নামে। ইংরাজি তারিখ অনুযায়ী প্রতি বছর ১০ বা ১১ এপ্রিল মেলাটি শুরু হত। অর্থাৎ বাংলা ক্যালেন্ডার হিসেবে বছরের প্রথম দিন, ১লা বৈশাখে। ৬ থেকে ৭ দিন মেলাটি চলত। প্রকৃত অর্থে মেলাটি ছিল পশুর মেলা। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন দ্রব্যের কেনাবেচাও চলত। মেলাটিতে যেসব পশু কেনাবেচা হত, সেগুলি হল ষাঁড়, ঘোড়া, হাতি, উট। এই মেলায় হাতি আনা হত দার্জিলিঙের তরাই অঞ্চল ও আসাম থেকে এবং তৎকালীন জমিদারেরা এগুলো কিনতেন। দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসত উট। বিভিন্ন দ্রব্য বহন করে নিয়ে আসার জন্য উটগুলো ব্যবহার করা হত। কিন্তু মেলায় সেই সব দ্রব্য বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর উটগুলোকেও বিক্রি করে দেওয়া হত। উটগুলো কিনতেন ধনবান মুসলিমরা। ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিমরা উটের মাংস খাওয়ার জন্য ওই উটগুলো কিনতেন। ঘোড়া আনা হত প্রতিবেশী বিহার এবং আরা থেকে। এই নেকমার মেলাটি অনুষ্ঠিত হত কুলিক নদীর তীরে শালবাড়ি পরগণার ভবানীপুর গ্রামে।

আলাওয়ার খাওয়া মেলাটি ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় মেলা। প্রতি বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হত। প্রায় ৮ দিন ধরে মেলাটি চলত।

ধলদীঘি মেলাটি বসত গঙ্গারামপুর থানার কাছে ধলদীঘি গ্রামেই। ফাল্গুন মাসের প্রথম দিনে মেলাটি শুরু হত এবং তা চলত ৮ দিন ধরে।

তৎকালীন দিনাজপুর জেলায় প্রধান ফসল ছিল ধান। সে সময় কালেক্টরের রিপোর্টে দিনাজপুর জেলায় জুন-জুলাই মাসে চাষ হত এমন চব্বিশ ধরনের ধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, মে মাস নাগাদ চাষ হত এমন আট ধরনের ধানের কথাও জানা যায়। এছাড়াও ওই রিপোর্টে দিনাজপুরে জই, যব, ভুট্টা, সরিষা, রাই, তিল প্রভৃতি এবং মুগ, মটর, খেসারি, মসুর, অড়হর প্রভৃতি ডাল চাষেরও উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় এলাকার চাহিদা অনুযায়ী প্রায় গোটা জেলাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে তামাকের চাষ হত। অন্যান্য চাষের মধ্যে আখ, পান, আলু, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ প্রভৃতি চাষের কথাও জানা যায়।

কালেক্টরের রিপোর্ট অনুসারে মিঃ হান্টার সে সময় কৃষি শ্রমিকদের মজুরির হারের কথাও উল্লেখ করেন। মিঃ হান্টারের বিবরণ অনুযায়ী, সেই সময় অর্থাৎ ১৮৭০ সালে কৃষি শ্রমিকদের মজুরির হার ছিল খাওয়া সহ মাসে চার টাকা এবং খাওয়া ছাড়া চার টাকা আশি পয়সা। ছুতোরদের আয় হত মাসে ৬ টাকা থেকে ৮ টাকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষি শ্রমিকরা আসত পূর্ণিয়া এবং অন্যান্য জেলা থেকে। তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হত কখনও দিন হিসেবে কখনও বা মাসিক ভিত্তিতে। কৃষিক্ষেত্রে সার হিসেবে সাধারণভাবে গোবরের ব্যবহারের প্রচলন ছিল বেশি। কালেক্টরের রিপোর্ট অনুসারে মিঃ হান্টারের বিবরণে জানা যায় যে, এই গোবর সার কখনই কেনাবেচা হত না। এই গোবর সারের দাম হিসেবে টাকা পয়সায় তার মূল্য নির্ধারণ করাও কালেক্টরের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এসময় শিক্ষাক্ষেত্রের যে পরিসংখ্যান মিলেছে তাতে দেখা যায়, ১৮৭০-৭১ সালে দিনাজপুর জেলায় সরকারি ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল মোট ১৪৪ জন। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ইংলিশ স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪ টি। পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১০৮ জন। সাহায্যপ্রাপ্ত ভাষা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১৫ টি। পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৪৮৩৬ জন। এরমধ্যে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৮৬১ জন, মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৯৭৪ জন এবং অন্যান্য ১ জন। সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৮ টি। ছাত্রীর সংখ্যা মোট ১৮৪ জন। যার মধ্যে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৬ জন, মুসলমান ছাত্রী ১০৩ জন এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ৫ জন।

স্থানীয় এলাকার চাহিদা অনুযায়ী গোটা জেলাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে তামাকের চাষ হত। অন্যান্য চাষের মধ্যে আখ, পান, আলু, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ প্রভৃতি চাষের কথাও জানা যায়।

আবহাওয়ার দিক থেকে দিনাজপুর জেলা ছিল কলকাতা অপেক্ষা বেশ ঠাণ্ডা। এখানে গরমকালের আগমন দেরিতে হলেও রাত্রিকালে আবহাওয়া সব সময়ই ঠাণ্ডা থাকত। এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বজায় থাকত। তবু তৎকালীন রাজস্ব সার্ভেয়ারের মতে, গোটা জেলাটিই ছিল খুব অস্বাস্থ্যকর। গ্রামবাসীরা অনেকক্ষেত্রেই কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত এবং জ্বরে আক্রান্ত হত এবং তাদের শরীর ও চেহারার মধ্যে দুর্বলভাব প্রকট হয়ে উঠত। ১৮৬৯ সালের হিসেব অনুযায়ী গোটা জেলায় সে বছর শুধুমাত্র কলেরায় মারা যায় ৬০ জন। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে বংশীহারীতে এবং এপ্রিল মে-মাসে হেমতাবাদ ও রাজারামপুরে বসন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়ার কথাও জানা যায়। এসময় মোট ২৮১ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং এরমধ্যে ২৬ জনের মৃত্যু হয়। ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দ্য দিনাজপুর চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি'। ১৮৭১ সালে গোটা বছরে এই ডিসপেনসারির আউটডোরে চিকিৎসার সুবিধা পেয়েছিল মোট ২৬৫২ জন। ১৮৭২ সালে ওই সংখ্যাটা ছিল ২৩৯৬ জন। ১৮৭২ সালের অক্টোবর মাসে রায়গঞ্জে আরও একটি ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় এক জমিদারের সহায়তায় ওই ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সে সময় দিনাজপুর জেলায় ডাক্তার ছাড়াও কবিরাজদের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। কবিরাজী চিকিৎসায় ভেষজ ওষুধ হিসেবে আদা, জোয়ান, আম কুসি, আলু বোখারা, আমলা, ইমলি বা তেঁতুল পাতা, আমরুল, ডালিম, বাবলা, বেল, বেল গাছের ছাল, ভাং, কালো জিরা, কালমেঘ, পুদিনা ইত্যাদির ব্যবহার করা হত। ওই সময় দিনাজপুর জেলায় কবিরাজদের দ্বারা মোট ৯৮ ধরনের ভেষজ ওষুধের ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা জানা যায়।

পঞ্চায়েতের হাত ধরে নতুন দিশা দেখালেন কলম্বাস তিরকি

বালুরঘাটের ৪নং বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার একটি স্কুল, নাম ওসাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়। সদিচ্ছা আর প্রচেষ্টা থাকলে যে অনেক কিছুই করা সম্ভব, সেই কথাটাই আবারও একবার প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কলম্বাস তিরকি। স্কুলের বাচ্চাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের পুষ্টির কথা ভেবে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন তিনি।

২০১২ সালের মাঝামাঝি সময়, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির মান বৃদ্ধির পাশাপাশি চার দেওয়ালের গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে এসে শিক্ষাকে কিভাবে আরও আনন্দদায়ক করা যায় এবং কিভাবে হাতে-কলমে শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায়, তা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। একাধিকবার আলোচনা হয় অভিভাবক ও সাধারণ গ্রামবাসীদের সাথেও। ব্যবস্থা করা হয় এলসিডি শো-এরও। বেশ সাড়া ফেলে দেয় এই ভাবনা। তবে প্রধান শিক্ষকের মনে তখনও কিছুটা দ্বিধা ছিল। কীভাবে সম্ভব হবে এই কাজ? স্কুলের ধরাবাধা সময়ের মধ্যে এইসব করা কি আদৌ সম্ভব? এনিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। কারণ শিক্ষার প্রচলিত ধ্যান-ধারণার মধ্যে থেকে তখনও তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি। পঞ্চায়েতও এক্ষেত্রে বেশ ধৈর্যের পরিচয় দেয়। নিয়মিত আলোচনা চলছিল প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে।

অবশেষে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ পঞ্চায়েতের তরফে ওসাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি-পরিমাপ পদ্ধতি বা বিএমআই এবং এলসিডি শো। এলসিডি শো-এর মাধ্যমে সে সময় ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জীব-জন্তু ও সরীসৃপ প্রাণীদের পরিচিতি, ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালার পরিচিতি ও তার ব্যবহার, বিভিন্ন নীতিকথা ও শিক্ষামুলক কাহিনীচিত্র ইত্যাদি দেখানো হয়। এগুলো সবই দেখানো হতে থাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। আর এই চলচ্চিত্রগুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছে দ্রুত খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরফলে এলসিডি শো-এর দিনগুলোতে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার। যার ফলস্বরূপ একটু একটু করে বদলাতে থাকে প্রধান শিক্ষকের মানসিকতাও।

প্রধান শিক্ষক ধীরে ধীরে এই প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ধারণায় অনুপ্রাণিত হতে থাকেন। একমাত্র ওসাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আগ্রহ ও প্রচেষ্টাতে স্কুলে পুষ্টি বাগান এবং ফলের নার্সারী তৈরি হয়। ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির পরিমাপ হওয়ার পর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তাদের বাড়িতে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির বীজও দেওয়া হয়। বাড়ির আশপাশে লাগানোর জন্য ওইসব বীজ তারা তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, কোন সবজির বীজ কোন সময় লাগাতে হয়, নার্সারীর জন্য মাদার বেড কীভাবে তৈরি করতে হয়, মাদার বেডে কীভাবে বীজ রোপণ করতে হয়, নার্সারীর প্যাকেটে বীজ রোপণ করার আগে তাতে কীভাবে মাটি ভরতে হয়, তা যেমন তারা নিজেরা হাতে-কলমে করতে করতে শিখতে থাকে, তেমনই কোন কোন সবজি ও ফলের কী কী খাদ্যগুণ রয়েছে এবং তা কোন কোন সময় লাগাতে হয় তাও তারা শিখতে ও জানতে শুরু করল। বাগান হলেই তো হবে না, প্রয়োজন তাকে রক্ষা করা। তাই প্রধান শিক্ষকের এই উদ্যোগ দেখে এগিয়ে আসেন গ্রামবাসী ও অভিভাবকরা। তাদের সহায়তায় প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের খোলা মাঠের চারপাশে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থাও করেন। সবুজ শাক-সবজি ও ফল গাছের সমারহে চেহারাটাই বদলে গেল ওসাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

যে মানুষটির হাত ধরে এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেয়েছে, মানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কলম্বাস তিরকি খুবই সাধারণ, বিনয়ী ও কম কথার শান্ত স্বভাবের মানুষ। কখনই আবেগ চেপে রাখতে পারেন না। বাগানের কথা উঠলেই তিনি আবেগের সঙ্গে বলেন, "এখন এই বিদ্যালয়ের পুষ্টি বাগানে সারা বছরই যেমন নানান শাক-সবজি থাকে, তেমনই থাকে বিভিন্ন ফলের গাছ। পেঁপে, লেবু, নজনে, আম, পেয়ারা, কলা, কী নেই সেখানে? ঋতু অনুযায়ী মাচায় থাকে পুঁই, সিম, উচ্ছে, করলা। বিদ্যালয়ের চালে থাকে লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি, দেওয়ালের পাশে পাশে থাকে লঙ্কা, বেডে থাকে পালং, ধনে, মুলো এবং আরও কত কী।" পঞ্চায়েতের সহায়তাতো আছেই পাশাপাশি আজ নিজের উদ্যোগেও তিনি বাজার থেকে বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ ও চারা কিনে আনেন। সত্যি বলতে কি, গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে-কলমে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ভাবনা আর পুষ্টির মানোন্নয়ন কর্মসূচির অনুপ্রেরণা ও তাদের সহায়তায় এই বিদ্যালয়ের আগাছাময় মাটি আজ হয়ে উঠেছে উর্বর। যেদিকেই চোখ পড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ। আর এসব কথা মনে করতেই, আজ শুধু প্রধান শিক্ষকের মুখেই নয়, তাঁর দুই সহ শিক্ষক অ্যালবার্ট তিরকি এবং বাপন দেবনাথের মুখেও দেখা মেলে এক পরিতৃপ্তির হাসি।

পরিবেশে থেকে শিক্ষা, পরিবেশ থেকে শিক্ষা, পরিবেশ বাঁচানোর শিক্ষা

শিরোনামের কথাগুলো নতুন নয়। এরমধ্যে রয়েছে হাতে-কলমে পাঠদানের উদ্দেশ্য, রয়েছে শৈশব থেকেই আগামী প্রজন্মকে গাছ ও তার চারপাশের পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল করে তুলে ধংসের হাত থেকে সবুজকে রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রকের বন-নিয়মনীতি বিভাগ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমাদের আশা, এই উদ্যোগে সারা দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সবুজ হয়ে উঠুক স্কুল প্রাঙ্গণ।

স্কুল নার্সারী যোজনা

''পর্যবেক্ষণ করতে, শিখতে, রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমার গাছকে বড় করে তোল''

ক) পরিকল্পনার উদ্দেশ্যঃ

গাছের সঙ্গে ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়াদের সম্পর্ক গড়ে তোলা, নিজেকে পরিবেশের একজন ভাবতে শেখা, জীবন্ত পরিবেশ ও গাছের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা। ছাত্রছাত্রীদের মাটি, সার, বীজের কাছাকাছি নিয়ে আসা, শহরাঞ্চলের পড়ুয়ারা যার অভাব বিশেষভাবে বোধ করে। স্বাভাবিক নিয়মে চারা বড় হয়ে ওঠার পদ্ধতি শিখতে ও বুঝতে পারা। ঔষধি গাছ, সুন্দরায়ণের কাজে লাগা গাছ, তৃণ জাতীয় গাছ, বড় বৃক্ষ এবং পাত্রে রাখা গাছ ইত্যাদি বিভিন্ন গাছকে সামনে থেকে বড় হতে দেখার জন্য তাদেরকে ওইসব চারা দেওয়া, যা তারা তাদের বাড়ির আশেপাশে লাগাবে, দেখভাল করবে এবং চারাগুলোকে বড় হতে দেখবে। গাছ ও উদ্ভিদের বিভিন্ন উপকার সম্বন্ধে জানতে ও চিনতে শেখা। নার্সারীর জন্য ছাত্রছাত্রীদের তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা গাছপালা পর্যবেক্ষণ করা ও বীজ সংগ্রহের সুযোগ করে দেওয়া। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে সুবিধামতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের নিজেদের হাতে বড় হতে থাকা চারাগুলোকে বিশেষ অতিথি ও অন্যান্যদের দেওয়া।

খ) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহঃ

১। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে পরিকল্পনাটি আগামী পাঁচ বছরের জন্য নেওয়া হয়েছে। ২। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। ৩। নার্সারীতে গাছ বড় করে তোলার জন্য স্কুলে অবশ্যই ১০০ বর্গ মিটার ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে। ৪। শুরুতে রোপণের মরসুমে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে কমপক্ষে একটি চারা দেখভাল করে বড় করে তুলতে হবে এবং শিক্ষাবর্ষ শেষে তা বাড়ি নিয়ে গিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ৫। পরিকল্পনার প্রথম বছরে ১০০০টি স্কুলকে চিহ্নিত করা হবে এবং নার্সারী তৈরির পরিকাঠামো, অন্যান্য সহায়তা ইত্যাদি ও চারা বড় করার খরচ বাবদ ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হবে। যথাক্রমে এর পরের দু'বছর ওই স্কুলগুলোকে দেখভাল বাবদ আরও ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে, তবে তা একমাত্র মিলবে নার্সারীর অবস্থা যদি সন্তোষজনক থাকে। ৬। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুদানের জন্য প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন স্কুলকে বেছে নেওয়া হবে। ৭। চিহ্নিত স্কুলগুলোকে নিচের ছক অনুযায়ী তথ্য রাখতে হবে। ৮। রাজ্যভিত্তিক প্রকল্পের প্রস্তাব জমা করবে রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ. (ক্যাম্পা), যাতে অবশ্যই তাদের পরিচালন কমিটির অনুমোদন থাকতে হবে। ৯। এই প্রকল্প কখনই রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ.-র বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হবে না। নিজের তহবিল থেকে এন.সি.এ.সি.-এর জন্য অর্থ দেবে। ১০। এন.সি.এ.সি-র দেওয়া টাকা জমা হবে রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ.-এর অ্যাকাউন্টে, যা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র এই পরিকল্পনার জন্য একটি পৃথক অ্যাকাউন্ট হিসাবে থাকবে।

গ) স্কুল নার্সারী যোজনা বাস্তবায়নের নিয়মনীতিঃ

১. যোগ্যতাঃ

১। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির সব ছাত্রছাত্রীরা। ২। স্কুলগুলোর অবশ্যই প্রায় ১০০ বর্গ মিটার সবুজ খালি জায়গা থাকতে হবে যেখানে নার্সারী গড়ে তুলে সবুজায়ন ঘটানো যায়। ৩। পরিবেশবান্ধব ক্লাবের সঙ্গে কাজ করা স্কুলগুলো এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। ৪। কমপক্ষে পাঁচ বছর নার্সারী দেখভালের ব্যাপারে স্কুলের প্রিন্সিপালকে সম্মত হতে হবে। ৫। স্কুলে বৃষ্টির জল ধরে রেখে গাছে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে বা তা করে নিতে হবে এবং একবার ব্যবহৃত জলকে পুনরায় সেচের কাজে ব্যবহার করতে হবে বা বাজে জলকে তার উপযোগী করে তুলতে হবে। ৬। পরিকল্পনাটিকে ধীরে ধীরে প্রতি জেলার একটি স্কুলে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, পরবর্তীকালে যেগুলো প্রধান স্কুল হিসাবে গণ্য হবে এবং অন্য স্কুলকে এই ধরনের কাজে সাহায্য করবে।

২. পদ্ধতিঃ

১। নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছক মেনে স্কুলগুলো সংশ্লিষ্ট 'ডেপুটি কনজারভেটর অফ ফরেস্ট'(ডি.সি.এফ.)/'ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার '(ডি.এফ.ও.)-এর কাছে আবেদন করবে। ২। প্রত্যেক স্কুলকে কমপক্ষে ১০০০ হাজার সহজলভ্য প্রজাতির চারা তৈরি করার ব্যাপারে সম্মত থাকতে হবে। ৩। ডিএফও ওই আবেদনে অনুমোদন করার পর তা পাঠিয়ে দেবে রাজ্যের সি.এ.এম. পি.এ.-এর কাছে। ৪। এরপর সব আবেদনপত্র রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ.-এর অনুদানের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য

একত্রে পাঠাবে তাদের পরিচালন কমিটির কাছে। ৫। এই পরিকল্পনার অধীনে নির্বাচিত স্কুলগুলোকে অবশ্যই একটি দৃষ্টান্তমূলক নার্সারী গড়ে তুলতে হবে এবং নার্সারী পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন কাজকর্মের ছবিসহ প্রিন্সিপাল স্বীকৃত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। ৬। নার্সারী তৈরির যাবতীয় তথ্য ছড়িয়ে দিতে এবং স্কুল থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন/তথ্যাবলীকে জায়গা করে দিতে রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ. একটি অনলাইন 'ইন্টার্যাকটিভ ওয়েব পোর্টাল' তৈরি করবে। ৭। রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ./ডিএফও-র নিয়ন্ত্রণাধীন একগুচ্ছ বন দফতরের আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞরা থাকবেন, পেশাগত সহায়তা পেতে স্কুলগুলো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

৩. স্কুল নার্সারী যোজনার অন্তর্গত বিভিন্ন কাজকর্মঃ

১। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির সব ছাত্রছাত্রীরাই নার্সারীর কাজ করতে পারবে। কাজটা বায়োলজি ক্লাসের নিয়মিত ব্যবহারিক অনুশীলন হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। ২। ছাত্রছাত্রীদের কাছাকাছি কোনও পার্ক বা উদ্যানে স্থানীয় শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া এবং আবহাওয়া পরিবর্তনে গাছের ও অন্যান্য উদ্ভিদের বৈশিষ্ট, এবং মরসুম পরিবর্তনে কীভাবে পাতা, গাছের ছাল, শাখাপ্রশাখার আকৃতি, ফুল, ফুলের রং ও নতুন পাতা, ফল, বীজ, ফুলের বার্ষিক সময়, তৃণ বা ঝোপঝাড় ইত্যাদির পরিবর্তন হয় তা যেন পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ৩। উদ্ভিদ ও গাছ চেনা। ৪। ছাত্রছাত্রীদের হারবেরিয়াম তৈরি করতে হবে, পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করতে হবে, ফল, বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। ৫। গাছের প্রসার বা বংশবৃদ্ধি ঘটাতে বীজ শুকনো করা, কাটিং ও গ্রাফটিং করা ইত্যাদি। ৬। মাটি, বালি, সার বা কোকো-পিট দিয়ে পাত্রে রাখার মিশ্রণ তৈরি করা। ৭। পলিব্যাগ, মাটির টবে মিশ্রণ ভর্তি করা। ৮। বীজ বপন, সদ্যজাত চারার দেখভাল, চারায় জল দেওয়া, আগাছা তোলা, চারা অন্যত্র রোপণ করা ইত্যাদি। ৯। গাছ লাগানোয় অগ্রাধিকার পাবে সহজলভ্য স্থানীয় প্রজাতি। ১০। পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা এবং স্কুল ও এলাকায় থাকা গাছপালার তথ্য রাখা। ১১। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে তারা যখন স্কুল থেকে পাশ করবে তখন তাদের গাছে চারা দেওয়া যেতে পারে যা তারা উপযুক্ত জায়গায়(স্কুল/পাড়ায়/বাসস্থান সংলগ্ন এলাকায়) লাগাবে ও দেখভাল করবে। ১২। ভাল কাজের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করা।

৪. আর্থিক সহায়তাঃ

১। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছে। ২। প্রথম বছরে স্কুল নার্সারী যোজনার জন্য আড়াই কোটি টাকা দেবে সি.এ.এম.পি.এ.। পরে দেখভালের জন্য ঠিক কতটা অর্থ প্রয়োজন তা বিচার করে বাজেট ঠিক করা হবে।

৩। বার্ষিক প্রয়োজনীয় আর্থিক চিত্রটা নিচে দেওয়া হলঃ

প্রথম বছর	নার্সারী তৈরি	দেখভালের প্রথম বছর	দেখভালের দ্বিতীয় বছর	মোট (কোটিতে)
২০১৫-১৬	২.৫০			২.৫০
২০১৬-১৭	২.৫০	১.০০		৩.৫০
২০১৭-১৮	২.৫০	১.০০	১.০০	৪.৫০
২০১৮-২০১৯	২.৫০	১.০০	১.০০	৪.৫০
২০১৯-২০	২.৫০	১.০০	১.০০	৪.৫০
২০২০-২১		১.০০	১.০০	২.০০
২০২১-২২			১.০০	১.০০

৪। প্রথম দফায় প্রতিটি স্কুল প্রয়োজনীয় সাহায্য/ পরিকাঠামো সহ নার্সারী তৈরির জন্য ২৫ হাজার টাকা অনুদান পাবে। স্কুলগুলো পরের দু'বছর নার্সারী চালানো ও পরবর্তী ধাপের ১০০০ চারা তৈরির জন্য ১০ হাজার টাকা অনুদান পাবে। তিন বছর পর থেকে স্কুলগুলো এই কর্মসূচি নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে যাবে। ৫। অনুদানের টাকায় প্রাথমিকভাবে নার্সারী বেড তৈরি, জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা, পাইপ, মাটি, সার, মাটির টব, পলিব্যাগ ও প্রয়োজনীয় সহায়তার কাজে খরচ করা যাবে। ৬। নির্বাচিত স্কুলগুলোকে এস.এফ.ডি. কারিগরি সহায়তা দেবে। ৭। রাজ্যভিত্তিক পরিকল্পনার প্রস্তাব সেখানকার সি.এ.এম. পি.এ.-তে জমা পড়বে এবং তাতে পরিচালন কমিটির অনুমোদন লাগবে। ৮। এই প্রকল্প রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ.-এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হবে না এবং নিজের তহবিল থেকে এন.সি.এ.সি পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থ দেবে। ৯। এন. সি.এ.সি.-র দেওয়া টাকা জমা হবে রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ.-এর অ্যাকাউন্টে, যা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তবে একটি আলাদা অ্যাকাউন্টও করা যেতে পারে। ১০। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রকের বন নিয়মনীতি বিভাগের মধ্যেই একটি 'প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' (পি.এম.ইউ.) তৈরি করা হবে, প্রকল্পটি পরিচালনা, দেখভাল ও প্রচার প্রসারের কাজ করবে। বার্ষিক খরচের ২ শতাংশ এই পি.এম.ইউ.-র কাজের জন্য ব্যয় হবে এবং ওই অর্থ দেবে এন.সি.এ.সি.।

ফর্ম – ১

স্কুল নার্সারী যোজনার আবেদনপত্র

১. স্কুলের নামঃ

২. জেলাঃ ৩. রাজ্য

৪. ঠিকানাঃ

৫. পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাঃ

৬. স্কুল নার্সারীর জন্য থাকা খালি জায়গার(বর্গ মিটারে) পরিমাণঃ

৭. দায়িত্বে থাকা শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম ও যোগাযোগঃ

৮. স্কুলের সম্মতি

আমি স্কুল নার্সারীর পরিকল্পনাটি পড়েছি ও এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে প্রস্তুত এবং পরিকল্পনায় উল্লেখিত নিয়ম-নীতি মেনে স্কুল নার্সারী গড়ে তুলতে সম্মত হলাম।

--------------------------------------- ---------------------------------------

দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর স্কুলের প্রিন্সিপালের স্বাক্ষর

স্থান_________________________________

তারিখ_________________________________

৯. ডি.সি.এফ./ডি.এফ.ও. দ্বারা পরীক্ষিত ও সুপারিশকৃত

সংশ্লিষ্ট ডি.সি.এফ./ডি.এফ.ও.-র স্বাক্ষর

১০. বিভাগীয় প্রধান/রাজ্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দ্বারা এগিয়ে দেওয়া।

ফর্ম -২

কাজ বস্তবায়নের অগ্রগতি রিপোর্ট

স্থান________________________________ তারিখ________________________________

১. স্কুলের নামঃ

২. ঠিকানাঃ

৩. কোন বছরের জন্য অনুদানঃ

৪. কাজের অগ্রগতিঃ

চারা তৈরির লক্ষ্যমাত্রাঃ ১০০০টি

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের ধরন	সংখ্যা/খরচ	দেখতে পাওয়া অগ্রগতি
১	নথিভূক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা		
২	জোগাড় করা জিনিসপত্র		
৩	মাটি তৈরির কাজ		
৪	পলিব্যাগ/মাটির টব ভর্তি করা		
৫	বীজ বপন		
৬	অঙ্কুরোদ্গম		
৭	চারা অন্যত্র নিয়ে বসানো ও দেখভাল		
৮	পাত্র/চারা তৈরি		
৯	কত চারা বিতরণ হয়েছে		
১০	পড়ে থাকা চারা		

মোট খরচঃ

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম ও স্বাক্ষরঃ

৬. প্রিন্সিপালের নাম ও স্বাক্ষরঃ

৭. পরিদর্শনকারী আধিকারিকের স্বাক্ষরঃ

(প্রতি বছর ৩১ শে অক্টোবর ও ৩১ শে মার্চ এই রিপোর্ট রাজ্যের সি.এ.এম.পি.এ.-কে জমা দিতে হবে, কপি পাঠাতে হবে এন.সি.এ.সি.-কেও)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PANCHAYATS & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

9^{TH} FLOOR, JOINT ADMINISTRATIVE BUILDING
BLOCK HC, PLOT 7, SECTOR – III,
SALT LAKE CITY, KOLKATA – 700 106

Memo. No. 3608(19) RD/O/MGNREGA/18M-02/12 Dated: 03.08.2016

From: Sudipta Porel, WBCS(Exe)
Deputy Secretary to Govt. of West Bengal

To: The District Nodal Officer, MGNREGA
.........................District

Sub: Live fencing and other activities in SSK & MSK

Dear DNO,

Enclosed herewith the letter from Paschim Banga Rajya Sisu Sikha Mission for making live fencing around the Sisu Sikha Kendra and Madhyamik Sikha Kendra under Panchayats and Rural Development Department having no boundary wall. The other required intervention like land development for kitchen garden, school orchard/plantation other permissible activities may also be taken up. Districts may prepare action plan accordingly in consultation with SSK-MSK Cell of the district and make necessary intervention with MGNREGA fund.

Monthly progress report of these intervention may please be sent to this end.

With regards,

Yours faithfully,

Enclo: Model Estimates for hedge nursery and fence-plantation

Sudipta Porel, WBCS(Exe) 4/8/16

Dy. Secretary to Government of West Bengal

Memo. No. 3608(19) RD/O/MGNREGA/18M-02/12 Dated: 03.08.2016

Copy forwarded to

The District Nodal Officer, SSK-MSK Cell, all Districts for information and necessary coordination.

Sudipta Porel, WBCS(Exe) 04/8/16

Dy. Secretary to Government of West Bengal

Paschimbanga Rajya Shishu Shiksha Mission

LB-2, Building No. 2 (Ground Floor & 2nd Floor)
Sector - III, Salt Lake City, Kolkata - 700 106
Phone: (033) 23359985, 23359986,23352413, 23355194
Fax: (033) 23359985, E-mail: pbrssm@gmail.com

Memo No: 381 (20)/ Mission- 327[II]/2016 Dated 21.07.2016

From: Sudipta Porel, WBCS [Exe.]
Administrative Officer
&
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal

To: District Nodal Officer, MGNREGA
District (All)

Dear Sir,

It is to bring to your knowledge that SSKs & MSKs under Panchayats & Rural Development spreading across the State are playing vital role to extend education to vulnerable segment of society. But, unfortunately substantial number of these institutions are facing sever infrastructural bottleneck.

I would request you to take up following activities in this financial year in the said institutions.

1. Live vegetative fencing around all such institution having no boundary wall.
2. Small orchard at such institutions having sufficient land.
3. Development of land within such orchard or outside so that kitchen garden or vegetable garden can be raised on such land.
4. Other infrastructural intervention permissible under MGNREGA.

Expecting your active co-operation.

With regards,

Yours faithfully,

Administrative Officer
&
Dy Secretary to the Govt. of WB

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/ জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত ও
শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

নবদিশার পথিকের প্রতিক্রিয়া

তারিখঃ____________________________

নামঃ__________________________________ দূরভাষঃ____________________________

ঠিকানাঃ____

পেশাঃ____

স্কুলের নামঃ____

(যদি প্রযোজ্য হয়)

নবদিশার গুণগত মানঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ	☐
নবদিশার বিষয়ঃ	প্রাসঙ্গিক	☐	অপ্রাসঙ্গিক	☐				
সৃজনশীলতাঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ	☐
প্রচ্ছদঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ	☐
লেখা দিতে ইচ্ছুকঃ	হ্যাঁ	☐	না	☐				

গুণগত মান নিয়ে মতামতঃ____

____

____

____

____
স্বাক্ষর

(অনুগ্রহ করে ফর্মটি কেটে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠানঃ
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌, ৩২/৬ গড়িয়াহাট রোড(সাউথ)
কলকাতা - ৭০০০৩১

নবদিশা

নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

নবদিশার পথিক হন

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আমরা আশা করি আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড সাউথ, কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯